মানব মন

এ সংখ্যার লেখ

আই, পি, পাভ

লিও অরবে

ডক্টর অরুণা হাল

ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টা

গোপাল হাল

আব্দুল ক

ডাঃ অজিত

ডাঃ সন্তোষ

সবিতা মুখোপাধ

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ

প্রথম সংখ্যা : অগস্ট ১৯৫১

মানব-মন

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের-আধুনিকধারা পরিচায়ক পত্র সংকলন

প্রথম সংখ্যা : আগষ্ট ১৯৬১

সূচীপত্র

ভূমিকা		৩
মনোভূমি তথা সংস্কার	ডক্টর অরুণা হালদার	৫
নারী-পুরুষের মানসিকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ	সবিতা মুখোপাধ্যায়	১৩
পিয়ের জেনেটের ভাববাদ সম্পর্কে	আই, পি পাভলভ	১৮
বিবাহকালীন মনোবিকার	ডাঃ অজিত দেব	২২
শিশুর উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য	লিও অরবেলি	২৫
যক্ষ্মারোগীর মন	ডাঃ সন্তোষ দাস	৩৩
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত	আব্দুল করিম	৪০
ভারতে আর্যসভ্যতার ক্রমবিকাশ	ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য	৪৬
কমলাকান্তের মন	গোপাল হালদার	৫১
পাভলভ পরিচিতি	ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫

প্রচ্ছদপট

অশোক গুপ্ত

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
এম. আর. সি. পি. (এডিন) ডি এস. সি.

ডাঃ সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. বি. ডি. পি. এইচ. (লণ্ডন)

ডাঃ অজিত দেব, এম.বি., ডি. পি. এম (লণ্ডন)

ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য,
এফ. আর. সি. এস. (ইং) টি. ডি. ডি.(ওয়েল্‌স্‌)

শ্রীগোপাল হালদার

ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর অরুণা হালদার

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

পাভলভ ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত

১৩২/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

Oranjita
Trade Mark

Manufactured by :—
RIMA PRODUCTS

90, ELLIOT ROAD, CALCUTTA-13
uppliers to Calcutta University Students' Canteen

প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক

চতুষ্কোণ

শ্রাবণ সংখ্যা প্রাকাশিত হল

দাম এক টাকা

কার্য্যালয় ঃ

২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ইঁটপুরী পেরিয়ে
চলো আসি বেড়িয়ে

'পায়ে-হাঁটা-পথ—
এ-পথে আছে আনন্দ,
আছে স্বাস্থ্য;
বলেছেন চার্লস্ ডিকেন্স্।

'আমার মতে আয়ুবৃদ্ধির এর চেয়ে প্রশস্ত পথ আর নেই।
অভ্যস্থ পথচারীর সন্ধানে এমন বৃদ্ধ অনেকেই আছেন
যাঁরা জরাকে জয় করেছেন পায়ে হেঁটে—উত্তর সত্তর অথবা
আশী হয়েও যাঁরা যুবকের মতো তেজীয়ান।'

Bata

বাটা সু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

ভূমিকা

অতি নমনীয় সহজ-শিক্ষাক্ষম নার্ভতন্ত্র মানুষকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী করেছে। এ স্বাতন্ত্র্যকে আরও বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তার কথা-বলা ও চিন্তা করার ক্ষমতা—তার ভাষার উপর অধিকার। সে স্যাপিয়েন্‌স্—চিন্তাবিদ : আবার হোমো—বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিচারক্ষম। সে নতুন কিছু দেখলেই যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট একটা কিছু করে বসে না। সে চিন্তা করে, সব কটি সম্ভাব্য ব্যবহারের কথাই সে মনে মনে চিন্তা করে। প্রয়োগ না করেই সে অনেক সময় ধরতে পারে কোনটা তার পক্ষে সঙ্গত। ভুল না করেই ভুল বুঝতে পারে। আবার ভাষা তাকে বিপন্নও করতে পারে। ভাষা বাস্তবকে বিমূর্ত করে, কাজেই মানুষকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। সত্যকে বিকৃত করতে পারে।

তাই অ্যাসলে মণ্টেগু লিখেছেন—To be human is to be in danger। বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় মানুষ তাই আজ আত্মরক্ষার অজুহাতে আত্মধ্বংসী অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা স্তূপীকৃত করছে। নিউট্রন বোমা তৈরির প্রথম পর্বও শেষ। নিউট্রন বোমার বিশেষত্ব এই যে এ বোমা পৃথিবীর প্রাণীভার লাঘব করবে। মানুষ মরবে কিন্তু আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটবে না, কলকারখানা বাড়িঘর অটুট থাকবে। যে সভ্যতা মানুষের থেকে অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছে তার পক্ষে এটা কিছু অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ এই আত্মধ্বংসী অভিযান থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু একদল মানুষ সত্যিই মনে করছেন এই পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জাই যুদ্ধকে থামিয়ে রাখবার একমাত্র উপায়। আবার কেউ কেউ ভাবছেন—সমস্যা-কণ্টকিত পৃথিবীর অজস্র সমস্যা নিরসনের একমাত্র উপায় সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।

মানুষের আসল সমস্যা কি ?

আমাদের জীবদ্দশায় তত্ত্বগত ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্যরকম উন্নতি ঘটেছে। এই এখনই মহাশূন্য পথে শূন্যচারী মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রিত মহাব্যোমযানে পৃথিবী পরিক্রমায় রত। পারমাণবিক-বিদ্যার দৌলতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সমৃদ্ধ। যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তাপ্রয়োগে মানুষের কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রম লঘুকৃত। বিজ্ঞান আজ স্বার্থান্বেষীর কবলমুক্ত ও সুপ্রযোজিত হলে মানুষের সব অভাব-অনটন দূর করে তাকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করতে পারে। প্রচুর অবসর দিতে পারে আর সেই অবসর বিনোদনের জন্য দিতে পারে অজস্র সংস্কৃতিমূলক চিত্তসমৃদ্ধকারী কাজের সন্ধান। অস্ত্রসজ্জায় নিয়োজিত অর্থের সুপরিকল্পিত বিনিয়োগে পৃথিবীর অনশন অর্ধাশন যে কয়েক বছরের মধ্যেই দূর হতে পারে—এ আজ আর আদর্শবাদীর স্বপ্নবিলাস নয়, একেবারে অবধারিত।

আসল সমস্যার নিরসন না হলে—এ আশা কিন্তু সুদূর পরাহত। আসল সমস্যা মানবিক সম্পর্ক গঠনের মূলগত কারণ নির্ণয় ও সে-সম্পর্কের উন্নয়ন ব্যবস্থা। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই অন্য সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মানব-মন সম্পর্কে যে সব তত্ত্ব এ যাবৎ বহু প্রচারিত ও একরকম অভ্রান্ত বলে অনুমিত—সেগুলোকে পুনর্বিচার করে দেখা আজকের দিনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ অনিবার্য, মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা তার সত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য—এই প্রচার সর্বব্যাপী। কাজেই মানুষকে ভালবাস—এ উপদেশ সভ্যতার সেই প্রথম দিন থেকে বর্ষিত হলেও মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারছে না। পরিবারের মধ্যে গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখছি স্বার্থ-সংঘাতজনিত কলহ ও বিদ্বেষ।

ধর্মগত, জাতিগত বিভেদ-সংঘর্ষের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের অনিবার্যতা ও প্রতিযোগিতার অপরিহার্যতা,—মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতদের মুখ থেকে শুনে-শুনে—অভ্রান্ত মনে করতে আমরা আজ অভ্যস্ত।

উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লব ও শিল্পপ্রসারের দিনে ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজছিল মানুষের মন। ব্যাখ্যা এল টমাস রবার্ট ম্যালথাসের (১৭৬৬-১৮৩৭) কাছ থেকে। শিল্পমালিকদের খুব সুবিধা হল। ডারুইন প্রজাতির বিবর্তনের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে (১৮৫৯) ম্যালথাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেন ও তাঁর 'বাঁচবার জন্য লড়াই'-তত্ত্ব শিক্ষিতমহলে সরাসরি গৃহীত হল। হার্বার্ট স্পেন্সার আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। শ্রেণীসংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক লড়াইকে তিনি জীব-জগতের ধর্ম বলে প্রচার করলেন। তারা শুধু বাঁচবে—যারা শক্ত আর উপযুক্ত—এই শিক্ষা মানবমনকে আচ্ছন্ন করল। মানবিক গুণ যেমন ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি—এগুলো মানব-মনে থাকলেও মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এদের প্রয়োজন নেই।

বিশ-শতকের মানুষ আরও প্রামাণ্য-সূত্র খুঁজছিল। এলেন জেমস্, এলেন ফ্রয়েড অ্যাড্‌লার-ইয়ুং।—মানুষে-মানুষে শক্তি, বুদ্ধি ও মানবিকতার তারতম্য—এঁরা অভ্রান্ত সত্য বলে জাহির করলেন। আরও শক্তিশালী করলেন ম্যালথাস—স্পেন্সারের সর্বনেশে প্রচারকে নতুন-নতুন গবেষণা-লব্ধ তথ্য দিয়ে। মানব-মন নিয়ে গবেষণা—কিন্তু পদ্ধতি সেই পুরাতন ও সনাতন—আত্মজিজ্ঞাসা ও মনসমীক্ষা, অর্থাৎ অন্তর্দর্শন। শিল্পমালিকদের দল—যাঁরা আজ অধিকাংশ গবেষণা-কেন্দ্রের রুধির জোগান ও অনেক সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক—এই সব সূত্র ও তত্ত্ব বাজারে চালু করতে সাহায্য করলেন।

৭।৮।৬১

প্রাকৃতবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আজ অর্ধশতাব্দীর উপর। পাভলভ এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। এঁরা দেখিয়েছেন মানসিকতা প্রধানত পরিবেশনির্ভর। এ-ছাড়া প্রাণী-জগতেও যে অবিরাম বাঁচবার সংগ্রাম চলছে—একথাও আজ আর বিজ্ঞান স্বীকার করে না। প্রতিযোগিতার পাশে-পাশে সহযোগিতা আছে। এবং অনেক জীববিজ্ঞানী জোরের সঙ্গে বলেছেন—প্রতি-যোগিতা নয়, সহযোগিতাই আসলে বিবর্তনের কারণ।

মানব-সমাজেও আছে প্রতিযোগিতার পাশে-পাশে সহযোগিতা। যে-কোনো জিনিস উৎপাদন করতে গেলে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া চলেই না। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে—সমাজ-জীবনেও সাধারণত সহযোগিতা প্রতিযোগিতার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের এই সুস্থ ধারাটির প্রচার আলোচনা অতি সীমিত। এই পারমাণবিক যুগে, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মানুষের জানা প্রয়োজন—সে কি ও কেমন! লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করার ফলে, একসঙ্গে বাস করার ফলে, তার মধ্যে যে সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও ভালবাসার উন্মেষ হয়েছে—তার প্রভাব কতখানি তার জানা দরকার—বৈজ্ঞানিক আলোচনার মাধ্যমে। অন্ধ পাশব কামনা-বাসনা, না মানবিক সদ্‌গুণ—কোনটি বেশী শক্তিশালী, তার বোঝা দরকার। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের সূত্র ও তথ্যাবলীর সঙ্গে তার আশু পরিচয় অত্যন্ত প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে পাভলভ ইনস্টিটিউটের সভ্যগণের এই প্রচেষ্টা—'মানব-মনের' প্রকাশন। সকল মানুষের সহ-যোগিতা ও সহানুভূতি আমাদের কাম্য ও পাথেয়।

———

মানবমন
তথ্যবিবরণ
১৯৬১–৬২

{১৯৬১ সালে প্রকাশিত দুটি সংকলন আর
{১৯৬২ সালে প্রকাশিত সবটি ত্রৈমাসিক সংখ্যা
প্রকাশ ক্রমানুসারে, কালানুক্রমিক বাঁধানো।

১৯৬১ : সংকলন

(১) প্রথম সংখ্যা — আগস্ট ১৯৬১ — প্রচ্ছদ: সূচীপত্র + বিজ্ঞাপন ৪ পৃষ্ঠা
প্রবন্ধাবলী: ৩–৬২ পৃষ্ঠা।

* যথাক্রমে "ভূমিকা" – পৃ: ৫৪–৫৫ ও ষষ্ঠ দেওয়া হয়েছিল
পৃ: ৩–৪ রূপে "ভূমিকা" সম্পূর্ণভাগে অজানা। সংযোজিত।

(২) বিশেষ পাভলভ সংখ্যা: অক্টোবর ১৯৬১ — প্রচ্ছদ: সূচীপত্র + বিজ্ঞাপন ৪ পৃ:
প্রবন্ধাবলী: ৫–৬৪ পৃ:
চিত্র: আইভান পেত্রোভিচ পাভলভ (১৮৪৯–১৯৩৬)

১৯৬২ : ত্রৈমাসিক

(৩) ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা: জানুয়ারী ১৯৬২ — প্রচ্ছদ: সূচীপত্র ও বিজ্ঞাপন ৪ পৃ:
প্রবন্ধাবলী: ১–৬২ পৃ:

* মুদ্রণ-প্রমাদে পৃ: ৫, ৬, ৭, ৮ বাদ গেছে।

(৪) ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা: এপ্রিল ১৯৬২ — প্রচ্ছদ: সূচীপত্র + বিজ্ঞাপন ৬ পৃ:
প্রবন্ধাবলী: ৭১–১২৮ পৃ:

(৫) ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা: জুলাই ১৯৬২ — প্রচ্ছদ: সূচীপত্র + বিজ্ঞাপন ৬ পৃ:
প্রবন্ধাবলী: ১–৬৬ পৃ:

* ১ম সংশোধন: বিজ্ঞাপন ১–৮ পৃ:; সম্পাদকীয় ইত্যাদি
১–১৬ পৃ: রূপে সংযোজিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা
(প্রকৃত: ৬৪ পৃ:) সংযোজিত

(৬) ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা: অক্টোবর ১৯৬২ — প্রচ্ছদ: সূচীপত্র + বিজ্ঞাপন ১২ পৃ:
প্রবন্ধাবলী: ১–৭২ পৃ: + (১–৪২ গ্রাফিক)
+ ক, খ, গ, ঘ.

— o —

অল্প পরিশ্রমেই
আপনি যদি
অবসন্ন হয়ে পড়েন
তখন নিয়মিত ব্যবহারে
ভাইনো-মল্ট
প্রাণোচ্ছল টনিক

আপনাকে
উদ্দীপনা যোগাবে

বেঙ্গল ইমিউনিটি

/BI/VM/1-59

আপনি কি রুশ ভাষা শিখতে চান ?

গ্রাহকরা পত্র লিখুন

আমাদের পত্রিকার ১৩নং সংখ্যা (১৯৬১ সালের জুলাই মাসের প্রথম সংখ্যা) থেকে রুশ ভাষা শিক্ষার পাঠমালা প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের পত্রিকার সকল ভারতীয় ভাষা সংস্করণে ক্রোড়পত্ররূপে এই পাঠমালা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই ক্রোড়পত্রের জন্য আলাদা কোন দাম দিতে হবে না।

রুশ ভাষা শিখতে ইচ্ছুক এমন বহু গ্রাহকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আমরা পত্র পেয়েছি। আপনি যদি আমাদের পত্রিকার গ্রাহক হয়ে থাকেন এবং রুশ ভাষা শিখতে চান, তা হলে আপনার গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও কোন ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা চান তা লিখে পাঠান।

পত্র লিখবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার

সোভিয়েত দেশ অফিস

১/১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

মনোভূমি তথা সংস্কার

অরুণা হালদার, এম. এ. ডি, ফিল.

কোনো কোনো লোকের বিশেষ কাজের উপযোগী একপ্রকার বিশেষ নিপুণতা থাকে—সেই নিপুণতাকে আমরা সাধারণ ভাবে বলি 'সংস্কার'। আবার কখনও কোনও বদ্ধমূল ধারণাকেও বলি 'সংস্কার' যেমন 'কুসংস্কার'। প্রথমকার 'সংস্কার' আর দ্বিতীয়বার বলা 'সংস্কার' কি এক? এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গেলেই সংস্কার শব্দটা কি জানতে হয়।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতবাদের হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। বৌদ্ধ-দর্শনের পরম্পরাও এদেশের হিন্দুদের আক্রমণে প্রায় ৭।৮ শত বৎসর পূর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায় তাঁদের দর্শনের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় যা শুধুমাত্র ভাবসর্বস্ব নয়। তা হল বুদ্ধিপ্রধান (Rational), এবং অপ্রমাণিত হ'লেও সৈদ্ধান্তিক (Empirical generalisation)। অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের কাঠামো হল কতকটা তৎকাল-পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক রূপ। এই বৌদ্ধগণ সংস্কার শব্দের এমনএকটি অর্থ করেছেন যা বর্তমানেও আমাদের সমীচীন মনে হয়। 'সংস্কার' মানে মূলতঃ তাঁরা ধরেছেন—কতকগুলি উপাদানের একত্রিত হওয়ার ফলে একরূপ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সর্বত্র ঘটে চলেছে। তথাকথিত বহির্জগৎ (External) হল 'সংস্কৃত রূপ'। তথাকথিত মনোজগত (Internal)-ও হল 'সংস্কৃত ধর্ম'। উপাদানগুলি সততই অস্থায়ী ও অস্থির রূপে পরস্পরের সঙ্গে মিশছে এবং বিযুক্ত হচ্ছে; তাঁদের মতে ক্রম পরিবর্তমান এইরূপ অবস্থা 'সংস্কার'। পৃথিবীর সকল কিছুই তাই তাঁদের মতে সংস্কৃত বা Constituted। এ সকল সংস্কৃত পদার্থের এক একটা 'পরিচয়' বা 'নাম' বুদ্ধি দিয়ে কাজ চালানোর জন্য ধরে নেওয়া হয়। নামের অর্থ কিছুই হয় না যদি না উক্ত সংস্কৃত পদার্থকে তা বোঝায়।

আমাদের মনে হয় 'সংস্কার' কথাটা বুঝতে হলে পূর্বোক্ত আলোচনা আমাদের কতকটা সহায়তা করে। তাই 'সংস্কার' বলতে হাতে আমরা কিছু পাই না যা দিয়ে তাকে প্রমাণ করে দেখাতে পারি। 'সংস্কারের' তা হলে কার্যকরী অর্থটা (functional meaning) নেওয়া যেতে পারে। মনের ক্ষেত্রে এটা হল কতকগুলি অবস্থার সমন্বয় (synthesis) ও তার পরিবর্তন। একদিকে দেখতে গেলে সেরূপ পরিবর্তন সর্বদাই হ'য়ে চলেছে। একই ধারায় 'জলস্রোত চলতে চলতে যেমন একটা গতির স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তেমনই মনঃস্রোত ভাবানুষঙ্গের প্রবাহের পর প্রবাহরূপে বয়ে চলেছে একটা সহজ খাতে। তার স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি হ'ল নিপুণতা। সংস্কারের প্রথম তাৎপর্যটি আমরা এ ভাবে বুঝলাম। অজ্ঞাত যে কোনও সমস্যা বারম্বার অভ্যাসের ফলে কিছু পরিমাণে অনায়াস হয়ে ওঠে। সেটাও জীবধর্ম। দৈবশক্তির (energy) অপব্যয় বা অপচয় নিবারণ করার জন্যই এরূপ প্রক্রিয়া আমাদের সহজাত হয়ে যায়। অবশ্য এই অভ্যাসের প্রক্রিয়া চক্ষের সামনে বা আড়ালে না ঘটলে তার ফল স্বরূপ অনায়াস নৈপুণ্য লাভ হবে না, এটা সত্য। আবার, তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে, অভ্যাসের ফল লাভেরও সীমা আছে। ব্যক্তি বিশেষে সেই সীমার তারতম্য হ'লেও, প্রায়ই তা একটা সীমার ওপরে যায় না—অভ্যাসের মাত্রা ছাড়ালেও না।

অপর পক্ষে, বৌদ্ধদর্শনের প্রধান প্রতিপক্ষ হিন্দু-দর্শনের কথাটা হ'ল—সংস্কারটা যেন কতকটা বদ্ধমূল অবস্থাতেই পাওয়া যায়। তাকে তৈরি করা যায় না। অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যাকে বলছেন, সংস্কার, তা জীববিশেষের শরীর

মনের কতকগুলি অভ্যস্ত ক্রিয়াজাল (habit pattern) ; তা ক্রমে বদ্ধমূল হয়েছে, সেই অবস্থায়ই তৈরি হয়ে আসেনি। 'হিন্দু-দর্শনের' কথাটা হ'ল জীব যেন তার 'প্রকৃতি' নিয়েই জন্মায়। এই প্রকৃতিই সেই জীবের destiny-র মত তাকে ঘোরায় ফেরায়। এরূপ চিন্তার মধ্যেও একটি অনায়াস-লভ্য সুবিধা আছে। সেই সুবিধা দিয়ে মানুষের সকল প্রকার ভালোমন্দের দায়িত্বকে 'কুসংস্কার' বা 'সুসংস্কারের' ফল ব'লে এক কথায় শেষ ক'রে দেওয়া যায়। (আমরা ংস্কারের দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগের এইভাবে উদাহরণটি এখানে দিলাম)। ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় 'সংস্কার' কথাটা এইভাবে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে।

মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বিশ্বের চিন্তাধারাতেও 'সংস্কার' কথাটার এর থেকে প্রয়োগের খুব প্রভেদ নেই। তার একটি হল বৈজ্ঞানিক প্রণালী। সেটির সূত্র পাওয়া যায় প্রাচীন চিন্তাধারার নানারূপ Empirical generalisation এর মধ্যে। বৌদ্ধদর্শনের মনোবিদ্যামূলক আলোচনাকেও আমরা সেই শাখায় রাখতে পারি। সেই শাখা থেকেই উত্তরোত্তর বিকাশের ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে বলা চলে। অপর দিকে আরো একটি চিন্তাশাখাও বয়ে গেছে—সে শাখারও বক্তব্য আছে। তার মধ্যেও কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিবেশিত হয়ে একপ্রকার ভাবগত অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছে বা এখনও করেছ। সে শাখার মধ্যে বহু চিন্তা হয়ত এখনও empirical generalisation মাত্র ; কার্যকারণসূত্রে তাকে প্রমাণ করা যায় না তবুও বিশ্বাসের গণ্ডীতে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। 'সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে'—ব'লে একটা প্রবাদ আছে। সেই সর্ষে দিয়ে নাকি ভূত তাড়ানো ওঝার পক্ষেও সম্ভব নয়। ভাবনাজগতের এই সংস্কারগুলি নিশ্চয়ই 'কুসংস্কার'। তাদের দীর্ঘকাল ধ'রে অভ্যাস করানো হয়েছে। তাতে ক'রে কিছু সুবিধা পূর্বেও পাওয়া যেত এবং এখনও যে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। সুতরাং সেগুলি ভূতগ্রস্ত সর্ষের মত সুসংস্কারের নামেই চলে এসেছে। তাদের তাড়ানো খুব কঠিন।

এবার তা হলে সংস্কারের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপট থেকে সোজাসুজি আধুনিক অবস্থার আলোচনা করা যেতে পারে। সংস্কারের প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই বদল হয়নি। বদল হয়েছে সংস্কারকে দেখবার—কি বলব ? 'সংস্কার' অথবা দৃষ্টিভঙ্গী। মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মনীষার মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। অতএব বর্তমান বিষয়ের পরিভাষাও বহু অংশে পাশ্চাত্য ভাষার মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি। বিশেষ ক'রে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এ যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেজন্য সংস্কার বললে যা স্পষ্ট হয় না—association কিংবা tendency বললে তা অনেকাংশে বোঝা যায়। সংস্কার বললে মনে হয় বুঝি ও কথাটা অচল ; অথচ attitude বললে মনে হয় যেন অনেকটা বুঝেছি। অথচ, ঐ তিনটা কথাই অর্থাৎ association, tendency কিংবা attitude কোনোটাই পর্যায়শব্দ নয়। অথচ তিনটা কথা দিয়েই সংস্কারকে খানিকটা খানিকটা বোঝানো যায়। সংস্কার কথাটার তবে সত্যিকার অর্থ কি ? তদুত্তরে বলা চলে বস্তুতঃ—মনোবিদ্যা কেন, কোনও বিদ্যা অথবা Special Science কথার অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারণ বিদ্যার ক্রমবর্ধমানরূপের সঙ্গে সঙ্গে পারিভাষিক অর্থেরও বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ প্রতি কথার জ্ঞাত্যর্থ বা Connotation একান্তভাবে অর্থক্রিয়াকারী বা functional। এ সকল সুবিধা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা কতকটা 'সংস্কার'-মুক্ত মনেই 'সংস্কার' কথাটির আলোচনা করব।

ধরা যাক একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল। সেই সদ্যোজাত শিশুদেহের সঙ্গে মাতৃগর্ভের বাইরেকার আবহাওয়ার স্পর্শ ঘটল (contact)। তার 'কান্না'কে কবিত্বের দৃষ্টিতে দেখে লাভ নেই। যদিও, কোনও কোনও দার্শনিক তথা মনোবৈজ্ঞানিকেও সেই ক্রন্দনকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখান্তক পরিস্থিতির সঙ্কেত ব'লে ধরেছেন ; কিন্তু এ সকল কথার অবস্থা কতকটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত। শেষ পর্যন্ত কথার খোসা ছাড়ালে পেঁয়াজটাই অদৃশ্য হয়। এখন সেই শিশুদেহের কলকব্জাগুলি সক্রিয় হয়ে উঠছে ; কতকটা বাইরের নূতন

পরিস্থিতিকে সে মানিয়ে নিচ্ছে, কতকটা পারছে না। ক্রমাগত তার শরীরে কোষে কোষে এই অস্থির পরিবর্তনের ধারা চলছে সাময়িক ভাবে স্থির হচ্ছে আবার বদল হচ্ছে। এই নূতন ও পুরানোর সমস্তক্ষণের দ্বন্দ্বই তার অস্তিত্ব, তার জীবন। তার প্রাণশক্তি এই দ্বন্দ্ব-সমাশ্রিত। এর মধ্য দিয়েই সেই শিশুদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন হচ্ছে এবং তার শরীর তার চেতনা বিকশিত হচ্ছে। এই ক্রিয়াগুলিকে যথারীতি আমরা nutrition, growth maturation বলে ধরি। এর প্রত্যেকটিই বিকাশ তথা development-এর ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়বাচক।

একটি শিশুদেহ বাইরে থেকে মায়ের দুধ কিংবা তজ্জাতীয় পদার্থ থেকে আহার গ্রহণ করছে; পরিপক্ক সেই আহার্য তার শরীরে আত্মসাৎকৃত হ'য়ে পুষ্টি জোগাচ্ছে, জীবন্ত দেহ পুষ্টি গ্রহণ করে শক্তিলাভ করছে বাড়ছে; সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্ধিত দেহযন্ত্রের অনুরূপ দেহযন্ত্রের ক্রিয়াগুলিও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। এর মধ্যে কিছু কোষ ক্ষয় পাচ্ছে। দ্রুত তাদের স্থানে অন্য কোষ তৈরি হয়ে স্থানপূর্ণ করে দিচ্ছে। অপরদিকে মৃত ও অকর্মণ্য কোষগুলি শুধু বাতিল হয়ে যাচ্ছে না; স্থানচ্যুত ও বিতাড়িত হ'য়ে শরীর যন্ত্রের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেখানে বিতাড়নের প্রয়োজন নেই সেখানে শরীরযন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়াদির সাহায্যে সেই পর্যুদস্ত দূষিত কোষও পরিশোধিত তথা রূপান্তরিত হয়ে আবার শরীরের শক্তি যোগাচ্ছে। এ পর্যন্ত শরীর তথা মন জীবশক্তির দুটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া হিসাবে নয়—একই জীবন্ত শক্তির পৃথক পৃথক প্রকাশের রূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে বলা যায়।

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই স্তন্যপানাদি ক্রিয়াকে জীবশরীরের ইষ্ট সাধনতা প্রবৃত্তিজাত (for the purpose of the wellbeing of the orgainsm) ব'লে বলেছেন। নৈয়ায়িকগণ সমান অর্থবাচক 'জীবনযোনি যত্ন' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পূর্বে Instinct এবং তৎপরে পরিমার্জিত ক'রে unlearned activity অথবা propensity কথায় ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উক্ত সব ক'টি পর্যায় শব্দই এমন কিছু একটা হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে যেটা ঠিক বোঝানো হচ্ছে না— কিংবা বোঝাতে পারা যাচ্ছে না। unlearned activity বললে যে ক্রিয়া বোঝায় তা যেন সেই প্রথম থেকেই মৌলিকরূপে বর্তমান আছে। 'ই ষ্ ট সা ধ ন তা প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া' বললে আর এই মৌলিক আদিমতম শরীর ক্রিয়াগুলিকে unlearned বলা যায় না। কারণ এগুলি তখন উদ্দেশ্যমূলক বলে (goal directed) স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত দুটিরই একই স্থানে গলদ থেকে যাচ্ছে মনে হয়। এ ত্রুটি দূর করতে গেলে কল্পনার সাহায্য শুধু নিলে চলবে না— বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই কল্পনাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ফেলে ধোপে যা টিকে তা নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে তা হলে দাঁড়াবে—জৈবধর্মের কোনো ক্রিয়াই unlearned নয়, তা উদ্দেশ্যমূলক; সেই উদ্দেশ্য প্রতিক্ষণের অস্তিত্বের সহায়ক হ'লে গ্রাহ্য, নতুবা অগ্রাহ্য। নবজাত শিশু অবস্থা থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত, গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য সকল ক্রিয়া নিয়েই জীবশক্তি অভিব্যক্ত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ অস্তিত্বধর্মের এই প্রয়োগশালা laboratoryতে প্রতিক্ষণে প্রতি জীবন এই জাতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে ও তদ্দ্বারা নিজেকে টিকিয়ে রাখছে। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার যে অনায়াস নৈপুণ্য, উপাদানকে গ্রহণ বর্জনের যে স্বাভাবিক কৌশল ও অভিব্যক্তি, আমাদের মতে তাকে 'সংস্কার' বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন করা চলে যে এই 'সংস্কার' কি জাতীয় পদার্থ, ভৌতিক না মানসিক? এরূপ প্রশ্নের একদেশী উত্তর না দেওয়াই ভালো। দিলেও তা যুক্তিসম্মত (Logical) হবে না। বস্তুবাদী গোঁড়া দার্শনিকের মতেও 'সংস্কার' হবে ভৌতিকবস্তু থেকে প্রাপ্ত চেতনার একপ্রকার রূপ। "কিন্বাদিভ্যঃ মদশক্তিব্য চৈতন্যমুপজায়তে"। অপরদিকে ভাববাদী দার্শনিকের মতে অবশ্যই 'সংস্কার' একপ্রকার মূলীভূত চেতনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উভয় প্রকার

দার্শনিকের মতে সংস্কার এক প্রকার চেতনার রূপই দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য হবার দাবি রাখে। কিছুকাল পূর্বে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক তথা চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সাধারণত আমাদের দেশে মনোবিজ্ঞানকে এখনও একটা পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা হয় না। অন্ততঃ চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদগণ কিছুকাল আগেও মন-নামক কোনও একটি ক্রিয়া সম্বন্ধে 'হাঁ' 'না' কিছুই বলতেন না। সেই সূত্র ধরেই একজন চিকিৎসক বললেন চেতনা বা Consciousness কে তিনি electrical কিম্বা chemical একটি ক্রিয়ার সহজাতফলের (byproduct) মত মনে করেন ; অবশ্যই তার ভৌতিক আধার আছে কিন্তু সেই বস্তুটা ভৌতিক নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন—কয়লা থেকে আগুন পাওয়া যায় ; সেই আগুনের অনুভবটাই হ'ল 'উত্তাপ'। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন কয়লা—আগুন—উত্তাপ তথা ভৌতিক শক্তি—স্নায়বিক ক্রিয়া—চেতনা।

উপরি উক্ত উদাহরণটির সাহায্যে আমরা চেতনা কথাটিকে খানিকটা মাত্র বুঝতে পারি। কারণ খুব ভালো উদাহরণ দিয়েও একটা ঘটনাকে সম্পূর্ণ বুঝান যায় না। পূর্বোক্ত কথার সূত্র ধরে তা হ'লে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে, স্নায়বিক ক্রিয়াও শরীরের আর পাঁচটা ক্রিয়ার মত ভৌতিক উপাদানের থেকে প্রাপ্ত রাসায়নিক কিংবা (chemical) বৈদ্যুৎ (electrical) ক্রিয়া। উক্ত স্নায়বিক ক্রিয়ার যখন অনুভব হয় তখন আমরা নাম দিই চেতনা (Consciousness)। বলা বাহুল্য যে উক্ত চেতনা ও স্নায়বিক ক্রিয়াতেই আধারিত (based)। আগুনই কি উত্তাপ নয় ? উত্তাপ আগুন ছাড়া থাকেও না। তবুও উত্তাপের বোধটা আমরা আগুনের বোধের সঙ্গে একীকৃত ক'রে দেখি না। স্নায়বিক ক্রিয়া ও চেতনার সম্পর্কও আমরা সেভাবে বুঝতে পারি। তা হলে সমগ্র ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম : (১) শরীর ধর্মেই খাদ্যপ্রাণ ইত্যাদি রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা শরীরের মধ্যে গিয়ে আত্মসাৎকৃত হচ্ছে,পুষ্টি বৃদ্ধি প্রভৃতির কাজ চলছে;তার মধ্যে দিয়ে জটিল থেকে জটিলতর শক্তির জটিলতর ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হচ্ছে। কয়লারূপ কার্বন তৈরি হচ্ছে শরীরেই। সেই কার্বনের রূপান্তরণ হচ্ছে নানাবিধ শরীরক্রিয়ায় ; অনবরত তার স্বচ্ছন্দ পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সেই কার্বনের রূপান্তরণের এক একরকম প্রকাশ ঘটছে স্নায়বিক ক্রিয়াতেও। আমরা অনুভব করছি, মস্তিষ্কের অসংখ্য কোষরাশি অসংখ্য রূপে উত্তেজিত (stimulated) হচ্ছে, তার ফলে অসংখ্য ভাবস্পন্দন (stimulation), অসংখ্য অনুষঙ্গ (association) অভিব্যক্ত হচ্ছে। সেই সকল অনুষঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু আমরা সক্রিয় চেতনার সাহায্যে পরিবর্তিত করতে পারছি ব'লে অনুভব করছি। বলা বাহুল্য, সেই ভাবনাও একপ্রকার অনুভববৃত্তি ছাড়া অপর কিছু নয়। সেই সকল ভাবনার পুনরাবৃত্তিবশে অনুভববৃত্তি মার্জিত হচ্ছে, পরিশুদ্ধ হচ্ছে, উত্তরোত্তর বিকশিত হচ্ছে, কখনো বা অনায়াস নৈপুণ্যের সৃষ্টি করছে। আমাদের সকল প্রকার মানসিক ক্রিয়া সরল কিংবা জটিল সকল প্রকার রূপেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালী বিধৃত হ'য়ে আছে। উক্ত ক্রিয়া কখনও গভীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার রূপ নিচ্ছে, কখনও তা রাগে ক্ষোভে অস্থির, কিংবা বেদনায় চঞ্চল। কখনও তা নৈতিক এবং ঐচ্ছিক (moral & voluntary) পরোপচিকীর্ষায় অভিব্যক্ত ; কখনও তা আবার সৃষ্টিধর্মী কুশলী লেখকের সংযত কল্পনার বহিঃপ্রকাশ (expression through controlled association)।

চেতনা সম্পর্কে এই প্রকার একটা সূত্র গ্রহণ করে আমরা চলতে পারি, তা হ'লেও দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। যে কোনও কারণেই হোক মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারেনি ; এখনও তা মূলতঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোঠাতেই রয়ে গিয়েছে। বলা হয়, যে মনোবিদ্যার অনুশীলনের পক্ষে কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা আছে। 'মন চোখে দেখার বা স্পর্শ করার বস্তু নয়'—কিংবা 'কোনও ভৌতিক বস্তু নয়' ইত্যাদি কথা ব'লে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সত্যই যদি মন সম্বন্ধে তা বলা যায় তবে অন্যান্য

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তা বলা চলে না কি? ভৌতিক শক্তিই কি (Physical Energy) আমরা দেখতে পাই? যা দেখতে শুনতে পাই তা হ'ল মাত্র তার অভিব্যক্তি। মন সম্বন্ধেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অভ্যাসের ফলে অনুশীলিত হওয়া প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত মন যেন আমাদের কাছে 'অজ্ঞাত' তথা রহস্যময়। তাকে স্থির সিদ্ধান্তের মধ্যে এনে ফেলতে আমাদের অভ্যস্ত চিন্তাধারায় এখনও বাধে।

দ্বিতীয়তঃ, যে কারণেই হোক, কোনও বিজ্ঞানই জগতের সকল কিছুর শেষকথা জেনে ফেলতে পারে না। প্রতি বিজ্ঞানই জগতের এক একটা দিকের কতকগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা তথা কার্যকারণ সূত্র বার করার চেষ্টা ক'রে থাকে। বর্তমানে মনোবিদ্যাও তাই করছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই তাকে অপরাপর বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হচ্ছে এবং হবে। সমাজবিদ্যা, নৃবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যার (Sociology, Anthropology, Biology) চর্চা ব্যতিরেকে মনোবিদ্যার অনুশীলন সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মনোবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে প্রজননতত্ত্ব (Eugenics) চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine) এবং বিশেষ করে শারীরবিদ্যা (Physiology) আপনিই যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে ক'রে মন আর একটা অজ্ঞাত রহস্য থাকছে না। তা হ'লেও সব বিজ্ঞানেরই যে মৌলিক অপূর্ণতা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও তা আছে। প্রাণিবিদ্ এখনও বলতে পারছেন না, একটি শিশু প্রাণ সমবেত বহুপ্রকারের উপাদানের কোন প্রকার রূপান্তরণের ফল। শুধুমাত্র উপাদানগুলি সংগ্রহ করলেই সমন্বয় হয় না। কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক তথা ভৌতিক ক্রিয়ার অপরিহার্য (indispensable) ফল তা? তেমনি মনোবিদরাও সঠিক বলতে পারছেন না স্নায়বিক ক্রিয়ার ঠিক কোন বিশিষ্ট বিন্যাসের ফলে এক একটি বিশিষ্ট মানসিক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটে? চারুকলার বিকাশ কোন স্বচ্ছন্দ স্নায়ুবিন্যাসের ফল? অথবা দুজনের ভিতরে বাইরে পারিপার্শ্বিকের উপাদান সমজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও, একজন শান্ত প্রকৃতি এবং অন্যজন ডানপিটে হতে কি পারে না? পাঠ্য তথা অপাঠ্য রচনার উৎস চিত্ত কি একটিই? এমন অজস্র প্রশ্ন থাকতে পারে। এ সব প্রশ্নের উত্তর মনোবিজ্ঞান যখন দেবে তখনি আরও জটিলতর, আরও নতুনতর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সব বিজ্ঞানই যেমন একদিকে এক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে জটিল সমস্যার সমাধান করছে, তেমনি অন্যদিকে আর এক প্রশ্ন তুলে ধরছে, নতুন সমস্যা সামনে আনছে।

পূর্বেই আমরা বলেছি, চিকিৎসাবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার যোগাযোগ ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। মানুষ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে মোটামুটি মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে একটা ধারণায় এসে পৌঁছেছে। স্নায়ু অসংখ্য কোষমণ্ডলী তাদের সংস্থান বিন্যাসের ফলে প্রাণিজগতে উত্তেজনাকে গ্রহণ (sensation) এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাপন (Motor activity) ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। হাঁটা, চলা কিংবা সাঁতার দেওয়ার মত অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলি নিম্নতর প্রাণীজগতে অনায়াস নৈপুণ্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়। মনোবিদ ও শারীরবিদ্‌গণের মতে উক্ত ক্রিয়াগুলির সংস্থানকেন্দ্র বা নির্দেশক কেন্দ্র লঘু মস্তিষ্ক (sub-cortical ganglion)। ভাবলেশহীন কুকুরকে অন্তর্মস্তিষ্কের একটি বিশিষ্ট স্থানকে —থালামাসকে—বৈদ্যুৎদণ্ড সাহায্যে উত্তেজিত করে দেখা গেছে যে থালামাস নামক বিশিষ্ট স্থানটির উত্তেজনার সঙ্গে হর্ষ বেদনা এবং তজ্জাতীয় প্রক্ষোভের (Emotion) সম্পর্ক আছে। এই তথ্যগুলি আজকের দিনে অনেক মনোবিদ ও শারীরবিদ্‌গণ একযোগে মেনে নিয়েছেন। অবশ্য ম্যাসারমান প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে প্রক্ষোভের উৎস আসলে গুরুমস্তিষ্ক। থ্যালামাসের উত্তেজনায় যে প্রক্ষোভর সৃষ্টি হয়—সেটা মেকি—[জুলে ম্যাসারম্যান, Behaviour and Newsec 1943 Chap-—3] অপরদিকে, কতকগুলি তথ্য আজও আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। 'দুটো' চোখে কেন আমরা 'একটা' দেখি, এর সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। উল্‌টো করে ছবি ধরলে যেমন দেখায় আমাদের চোখের দৃষ্টিতেও স্বাভাবিকভাবে তাই দেখা উচিত। কিন্তু তা না হয়ে

আমরা চোখে গৃহীত উল্‌টো ছবিকে সোজা করেই 'দেখি'। মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলোর মোটামুটি কাজের ধারাটা আমরা জেনেছি। কিন্তু হঠাৎ একজায়গা বিকল হ'লেও কেন একেবারে সেই বিশিষ্ট ক্রিয়া অচল হ'য়ে পড়ে না—এও একটা সমস্যার বিষয়। আর, এই সকল সমস্যার উপর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা আমাদের গুরুমস্তিষ্ক বা cerebrum—মানুষের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তার কাজের অসম্ভব গুরুত্ব। সম্ভবতঃ সে-ই প্রধান নির্দেশক। তারই নিপুণ নির্দেশে,—কোনও কোনও অংশ বিকল হ'লেও—সামগ্রিকরূপে মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ কাজগুলি অব্যাহত ভাবে চলে। অন্ততঃ এমন একটা কথা আমরা আজ ভাবতে পারি।

শারীরবিদ্যার অনুশীলনে পশু ও মানুষের তুলনামূলক সমালোচনা অনিবার্যরূপেই এসে পড়ে। সেরূপ বিচার বিশ্লেষণে দেখতে পাওয়া যায় মানুষের মস্তিষ্কের ওজন ও পশুর মস্তিষ্কের ওজনে অনেকটাই স্পষ্ট তফাৎ। মানুষের ক্ষেত্রে তার গুরু মস্তিষ্ক বা cerebrum অনেক বেশি পরিমাণে সুগঠিত। বুদ্ধির ক্রিয়া এবং বুদ্ধির জটিলতা (complexity) ও তদনুপাতে মানুষের অধিক। অতএব এরূপ কল্পনা (hypothesis) করলে আপত্তির কিছু নেই যে:—(ক) মানুষের গুরুমস্তিষ্কের বিকাশ ও তার বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতায় নিয়ন্ত্রণাদি ক্রিয়ার বিকাশ, এই উভয় ক্রিয়ার মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কার্যকারণ ব্যবস্থা থাকা সম্ভব।

(খ) অপর পক্ষে পশুর স্তরে গুরুমস্তিষ্ক পূর্ণ বিকশিত নয়—তাদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও তদনুপাতে অপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ দুটি তথ্যের মধ্যেও কার্যকারণ ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

তা হ'লে আমরা পূর্বোক্ত সূত্রগুলিকে গেঁথে এনে একটা সিদ্ধান্তের মধ্যে আসি। তা হলো এই: প্রাণিজগতে প্রাণশক্তি একভাবে বিকশিত নয়—বিকাশের নানা স্তর আছে। জলজ এককোষী প্রাণীর স্তর থেকে প্রাণশক্তি ক্রমান্বয়ে বিকাশের ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। সেই বিকাশের ধারায় কোনও স্তরে, তা চিংড়ী কাঁকড়া, কোনও স্তরে মাছ, কখনও উভচর কখনও সরীসৃপ, কখনও পাখী কখনও স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ, আর শেষ পর্যন্ত তা মানুষ। এই প্রতিস্তরেই তদনুযায়ী চেতনার স্তরও অন্যান্য ক্রিয়ার মত বিকশিত হয়েছে। এককোষী আমিবাও বৈদ্যুৎদণ্ডের স্পর্শে নড়াচড়া করে, অর্থাৎ উত্তেজিত হয়। আর, মানুষের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি, মানুষ কখনও কবি কখনও বৈজ্ঞানিক কখনও সাধারণ সুখদুঃখের তরঙ্গে সে এই জগৎসংসারকে আশ্রয় করে চলছে। এই উভয় প্রকার মানুষের ক্ষেত্রেই, আমরা এখনও দেখছি, অনায়াসলভ্য অভ্যস্ত ক্রিয়াও আছে। আবার তা পশুরও আছে। অপর পক্ষে পশুর বৌদ্ধিক ক্রিয়া মানুষের মত এত বিচিত্র এত জটিল নয়। অর্থাৎ ধরা যেতে পারে পশুর বৌদ্ধিক ক্রিয়ার পেছনে যে স্নায়ুতন্ত্রীয় ক্রিয়াবিন্যাস আছে তার রকমফের কম। রদবদলের ক্ষেত্রও সেখানে সংকীর্ণ। পশুর গুরুমস্তিষ্ক স্বল্পবিকশিত। সঙ্গে সঙ্গে তার স্নায়ুতন্ত্রীমণ্ডলও হয়ত সংক্ষিপ্ততর—আকারে তথা কর্মেও। মানুষের গুরুমস্তিষ্কটি অনেক বেশি শক্তিশালী—বিশেষ করে তার উপরিভাগ (cortex)।

উনবিংশ শতকে ভিয়েনাতে ফ্রয়েড এবং রাশিয়াতে পাভলভ দুই বিভিন্ন দিক থেকে প্রায় একই সময় মনোবিদ্যার সার্থক অনুশীলন ক'রে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে নূতন তথ্য পরিবেশন করেন। ফ্রয়েডের মতে, বৌদ্ধিক ক্রিয়া হল মূলতঃ ব্যক্তিত্বের অতলে নিহিত অবচেতনার প্রতিরক্ষণ বা defence। পাভলভ বললেন, বৌদ্ধিক ক্রিয়া মানুষের ক্ষেত্রে গুরুমস্তিষ্কের এক বিশেষ রকম বিকাশের অভিব্যক্তি—একে তিনি secondary signalistic system আখ্যা দেন। বস্তুতঃ এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মনন ক্রিয়ার একটা বাস্তব ভিত্তিও ঘোষিত হ'ল—কারণ, 'মস্তিষ্ক'টা আর যাই হোক কাল্পনিক বা মানসিক মাত্র নয়। আমরা সত্যই 'মনকে' দাঁড় করাবার মত একটা জায়গা পেলাম। মানুষের ক্ষেত্রে তাই নানারূপ অভ্যস্ত ক্রিয়া অনায়াসলব্ধ নৈপুণ্য, এসকল চেতনার অভিব্যক্তি তো রইলই; উপরন্তু গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়াফলরূপে তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সমুজ্জ্বল বুদ্ধি, কল্যাণ-

বোধ এবং ইচ্ছানিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ এক কথায় সত্য এবং শিব দুইই। তাছাড়াও, সেই বুদ্ধিরই হৃদয়গত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে দেখা দিল অন্ধ আকর্ষণের ক্ষেত্রে সচেতন দায়িত্বশীল প্রেম, তথা পারিবারিক জীবনের সমগ্রতার প্রতি নিষ্ঠা, এবং আরও দূরপ্রসারিত সাহিত্যিক তথা শৈল্পিক বোধ। অন্ধতার স্থানে দেখা দিল আলোক। মানুষ সচেতন হয়ে বুঝল—

'আহারনিদ্রাভয় মৈথুনশ্চ সামান্যমেতদ্‌পশুর্ভি নরাণাম্‌
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষে, ধর্মেণহীনাঃ পশুভিঃ
সমানাঃ।

প্রসঙ্গতঃ, বলা প্রয়োজন, এদেশের প্রাচীন দার্শনিকগণও 'ধর্ম' বলতে Religion বা Piety বোঝেননি। তাঁরাও পশুর থেকে মানুষের প্রভেদ করেছিলেন বুদ্ধির স্পষ্টতা দিয়ে; তাকেই তাঁরা ধর্ম বলেছেন। সেই ধর্মানুসারেই তাঁরা বুঝেছেন, সচেতন বোধি নিয়ে, সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে জীবনকে সকারণ এবং উদ্দেশ্যবান করে তৈরি করা যায়। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক কালের চিন্তায় এ জাতীয় ভাবের বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি এক ধরণের বিশেষ attitude বা 'প্রবণতা' তৈরি করা যায়; তার সামাজিক ফল—বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ হ'তে পারে,—এবং তাকে অভ্যাস দিয়ে সুগঠিত করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত সেই গ'ড়ে নেওয়া ধারণাই আমাদের 'সুসংস্কার' বা 'কুসংস্কার' হ'য়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে পাশ্চাত্য মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে রাশিয়া ছাড়া ইংলণ্ড আমেরিকাতেও বস্তুতান্ত্রিক মনোবিদ্যায় প্রভূত অনুশীলন হয়েছে। মধ্য ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশেতেও ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার বহুল চর্চা হয়। বিভিন্ন মতের পুঁথিগত দিক বিচার না ক'রে চিন্তাজগতে তাদের প্রভাব ও অবদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে আলোচ্য নিবন্ধের শেষ করব। ফ্রয়েড়ীয় মনোবিদ্যাতে যে Unconsciousকে মানা হয় তাও কিন্তু জড়শক্তি বা প্রাণশক্তিমাত্র নয়; তাও হ'ল চৈতন্যশক্তিই যে চৈতন্যশক্তি অন্ধতায় অস্পষ্ট। তা পূর্বে উল্লেখিত প্রাচীন ভারতীয় যোগশাস্ত্রের মহাপ্রকৃতি অথবা তামসিক শক্তির মতই (আচার্য ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁর Psychology of Yoga গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন)। অপর দিকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'প্রকৃতির' মত অন্ধশক্তিকে মানবার প্রয়োজনই বোধ করেননি। তাঁরা (১) 'মনোজ অনুষঙ্গ' এবং (২) 'শরীরজ ক্রিয়া' নামে কতকগুলি ভাবনাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমটির নাম তাঁরা দিয়েছেন 'চৈত্ত' বা 'চিত্তসম্প্রযুক্ত সংস্কার' বা মনোময় সংস্কার। উদাহরণস্বরূপে তাঁরা রাগদ্বেষ মোহ থেকে শুরু করে, প্রীতি সৌজন্য শ্রদ্ধা বৈরাগ্য বা উপেক্ষা প্রভৃতি মনোভাবনাগুলিকে গ্রহণ করেছেন। প্রথমোক্ত মনোভাবনাগুলি 'অকুশলক' বা মন্দ এবং শেষোক্তগুলি 'কুশল' বা ভালো বলে ধরা হয় এবং সেই ভাবেই অনুশীলন করা হয়। এতদ্বিপরীত 'শারীর ক্রিয়া'-রও একটা আনুষঙ্গিক পরম্পরা তাঁরা মানেন। কিন্তু এগুলিকে তাঁরা নাম দেন 'চিত্ত বিপ্রযুক্ত' সংস্কার। অর্থাৎ মনোজ (mental) না হ'লেও এরা স্বাভাবিক ভাবেই শরীরজ (organic)। মানসিকতা ছাড়াও এরা সক্রিয়। উদাহরণস্বরূপে তাঁরা 'প্রাপ্তি' (achievement) 'জাতি, (birth) 'জীবিত' (organism) এবং নামকায় (names) পদকায় (words) এবং ব্যঞ্জনকায় (alphabet) প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। একটু অনুসন্ধিৎসু চোখেই ধরা পড়বে যে, এগুলির বিষয় তাঁরা কি বলতে চান। মনোজ ও শরীরজ উভয়বিধ অনুষঙ্গগুলিকেই তাঁরা 'সংস্কার' বলেছেন। রাগদ্বেষ ঘৃণা, ভালোমন্দ, উপেক্ষা, প্রীতি এগুলিও হ'ল একপ্রকার সচেতন এবং সামাজিক প্রয়োজন বোধে মেনে-নেওয়া তথা তৈরি-করা attitude, অপর দিকে লেখা কিংবা একটা নাম শেখা, একটা কোনও 'জিনিসকে' অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা এবং আয়ত্ত হয়েছে ব'লে লাভ করা বা 'প্রাপ্তি', এগুলিও অভ্যস্ত ক্রিয়ার রূপ; অভ্যাসের পরিপক্কতা ঘটলে আর সচেতন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকে না—তা 'অনায়াস নৈপুণ্যের' রূপ নেয়। সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখছি, প্রাচীন বৌদ্ধগণের মনোবিদ্যার অনুশীলনেও যুক্তি ছিল। বর্তমানেও আমরা প্রক্ষোভ বা

Emotion গুলিকে সামাজিক জীবনের অনুশীলনে প্রাপ্ত সংস্কার বলি। নীতি বিদ্যাও অনুশীলন সাপেক্ষ বলেই আমরা জানি--ভালো বা মন্দ দুইই আমাদের সংস্কারানুযায়ী করে আমরা তৈরি করি। আর বারম্বার শিক্ষণ বা অভ্যাসের দ্বারা যে জিনিস আমরা রপ্ত করি তা কতকটা আমাদের ব্যক্তিত্বের ধারায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মতই মিশিয়ে যায়, সেজন্য আর ভাবতে হয় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও আমরা ভাবি না, শিশু স্তন্যপান করার প্রবৃত্তিকেও ভেবে আয়ত্ত করে না, তা যেন তার শরীরই আয়ত্ত করে রেখেছে। তেমনি, বয়ঃ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখে ফেলতে পারলে আমরা আর ভাবি না 'অ' এর পর 'আ' কেন আসবে, কিংবা "আমরা' কথাটি কি ভাবে লিখব। একটা লোক এবং তার নাম দুটো এমন অচ্ছেদ্য ভাবে আমাদের মগ্নচেতনায় ব'সে গেছে যে, আমাদের ভাবতেও হয় না কি ক'রে দুটোর মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল—আর তা সত্যই কতটা সম্ভব। একটা মানুষ আর অন্যটা শব্দ কি ক'রে একটা অপরটার পরিচয় হ'ল তা সত্যই বিস্ময়কর।

উপরিউক্ত কর্মপ্রণালী কিন্তু সর্বদাই ঘটছে। মানুষের তথা সকল প্রাণীর জীবনেই ঐ অভ্যাসের প্রণালী বিদ্যমান। প্রত্যেক প্রাণীর অভ্যাস-ক্রিয়া তার শক্তির অনুপাতেই সাধিত হয়। সুতরাং মানুষের 'সংস্কার' তৈরি হয় মানুষের শক্তির অনুপাতে; তার রূপান্তরণ ক্রিয়াও সমানুপাতিক। একটি কুকুরের সংস্কার তৈরি হবে তার পারিপার্শ্বিক এবং নিজ শক্তির আনুপাতিক সহযোগে। নিম্নতম প্রাণিজগতের একটি কীট পতঙ্গ মাত্রেরও এরূপ কিছু না কিছু সংস্কার তৈরি হবে তার শক্তির মাত্রার সঙ্গে তাল রেখে। প্রতি ক্ষেত্রেই এসকল সংস্কার সাধিত হচ্ছে এবং রূপান্তরিত হচ্ছে। এই উভয় ক্রিয়াই মূলতঃ স্নায়বিক বিন্যাসের ফলাফল। এই স্নায়ুমণ্ডলীর বিন্যাস এবং পারস্পরিক টানা-পোড়েনে প্রাপ্ত যে ঠাসবুনানি তা'ই আমাদের 'মন'। তা হলে দেখতে পাচ্ছি 'মন' একটা 'বস্তু' নয়—কিন্তু বস্তু-ভারশূন্যও নয়। মন হ'ল মননক্রিয়া; তাকে অভিব্যক্ত দেখছি চেতনায় বা 'সংস্কারে'। তার পিছনে রয়েছে প্রাণশক্তির বিশেষরূপ প্রবাহ; সেই প্রবাহের আধার হল স্নায়ুতন্ত্রীজাল ও তাদের পারস্পরিক সংযোগ বিয়োগ প্রণালীর বিন্যাস। এই বিন্যাস কখনও সুসম কখনও বি-সম। স্নায়ুর বি-সম বিন্যাস থেকে অস্বাভাবিক ধরণের কিংবা অস্বচ্ছন্দ ধরণের মানসিক ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়। বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষেরও মননক্রিয়া আছে; সমাজ-বিরোধী দস্যু তস্করেরও মানসিক ক্রিয়া আছে; সেগুলিকে বলা যেতে পারে স্নায়ুর অসম বিন্যাসের অস্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি।

উপরি উক্ত এই বিন্যাস প্রক্রিয়াকে আমরা পাশ্চাত্য মনোবিদ্যার পরিভাষায়—Conditioning বলে বুঝি। কতকগুলি অনুষঙ্গ কোনও একটি বিশেষ nucleus অথবা stimulus কে ধরে বিন্যস্ত হ'তে থাকে। সেই বিন্যাস তখন একটি চিত্রকল্প বা pattern হয়ে দাঁড়ায়। অনুষঙ্গের pattern নির্ভর করছে তার আনুপাতিক স্নায়ুজালতন্ত্রীর বিন্যাস অথবা pattern এর উপর। বারম্বার ঐচ্ছিক অথবা অনৈচ্ছিক (voluntary অথবা involuntary) অভ্যাস দ্বারা এই pattern গুলি তৈরি হ'য়ে ওঠে। স্বল্প থেকে বৃহৎ, সরল থেকে জটিল, অথবা বিপরীত দিকেও তার আবর্তন বিবর্তন চলতে থাকে। সামাজিক ভালোমন্দের ফল পারিপার্শ্বিকের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে সেইটারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে বিন্যাসের মূল কাঠামোটার ওপর। এই ভাবেই চলে একটা সংস্কার থেকে আরেকটা সংস্কারে উত্তীর্ণ হওয়া, কিংবা আনাগোনা করা। একদিকে মানুষের মনোভূমি কতকগুলি অভ্যস্ত সংস্কারের বাঁধা ছকে আবর্তিত হচ্ছে--সে'ইই তার জীবনধারণ,--অন্য দিকে মানুষ সর্বদাই তার সক্রিয় বৌদ্ধিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, নূতন মূল্যায়ণের (value) সৃষ্টি করছে—সেটা হ'ল তার অভ্যস্ত সংস্কারের নবীনতর সংস্করণ তথা পুনরুজ্জীবন।

দ্রষ্টব্য ঃ

আলোচ্য নিবন্ধের জন্য আমি বহুক্ষেত্রে আমার সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাবিদ্ সুহৃদ্গণের মতামত কৃতজ্ঞচিত্তে অনুসরণ করেছি। তা সত্ত্বেও যেখানে কোনও চিন্তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে বা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে সে সকল স্থানে লেখিকার সীমিত জ্ঞানই দায়ী।

নারী-পুরুষের মানসিকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ

সবিতা মুখোপাধ্যায়

সাধারণতঃ নারীর মন কথাটা একটি স্বতন্ত্র গণ্ডিতে সীমিত করা হয়। এ স্বাতন্ত্র্য পুরুষ মনের তুলনায়। নারী-পুরুষের মানসিকতায় প্রকৃতই কোন পার্থক্য আছে কিনা এবং সেই পার্থক্য কিসের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলি মৌলিক ও শাশ্বত, না পরিবেশগত ও পরিবর্তনশীল এই সমস্যাগুলি এই নিবন্ধের আলোচ্য।

এ যাবৎ স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয়ে ও মানসিক শক্তির তারতম্যের বিচারে জৈব কারণ অর্থাৎ শারীরবৃত্ত-মূলক এবং আঙ্গিক পার্থক্যগুলিকেই একমাত্র কারণ বলে উপস্থিত করা হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ও পারিবারিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে, এমনকি সমাজের প্রকৃতি ও বিকাশের কারণ বিচারেও জৈব সম্পর্ককেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আধুনিককালে ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্ব এই ধারণাকে আরও পরিপুষ্ট করেছে। এঁদের মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে, তার বিচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক আচরণে, তার চৈতন্য-মানসের বিকাশে—প্রতিটি ক্ষেত্রে জৈবশক্তি কাজ করে চলেছে। সমস্ত রকম চিন্তা ভাবনা ও বৃত্তি নির্ণয়ে মানুষ লিবিডোর অর্থাৎ কামশক্তি দ্বারা পরিচালিত, এমনকি সমাজের ভাঙা গড়ায়, অর্থ নৈতিক বিন্যাস ও বিপর্যয়ের মূলেও এই ব্যক্তিগত লিবিডো। শুধু এই নয়, আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব ছাড়া আর সবেরই মূলে আছে আদিম প্রথম রিপু—এই হল ফ্রয়েডীয় মত। এক কথায়, সহজাত এই আদিম প্রবৃত্তিটিই মানুষের সামগ্রিক সত্তার নিয়ামক।

এই ধারণা অবশ্য ফ্রয়েডের অনুগামী শিষ্যরাও আজকাল পুরাপুরি মানেন না। হর্নি, ফ্রোম প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা 'কালচার' ও 'সামাজিক পরিবেশ', এ দুটি কথার উল্লেখ করছেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানসিক ক্রিয়া বা চৈতন্য বিকাশের ব্যাখ্যায় শেষ পর্যন্ত জৈব শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।(১)

ফ্রয়েডীয় ধারণা বহু প্রচলিত ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের পরিপোষক হিসেবে অতি সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু জনপ্রিয়তাই সত্যের মাপকাঠি নয়। একসঙ্গে বসবাস ও কাজ করার ফলে মানুষের মনে এমন কতকগুলি বৃত্তি ও গুণের উন্মেষ হয়েছে যা আমরা কিছুতেই প্রবৃত্তিমূলক বলতে পারি না। শুধুমাত্র বায়োলজিকাল বা জৈব কারণ দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না।

মানুষের মনন-ক্রিয়া, চৈতন্যের স্বরূপ ও সামগ্রিক আচরণের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় সামাজিক বা পরিবেশগত উদ্দীপকগুলিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আধুনিক শারীর-বৃত্তবিদদের মতে সামাজিক বা পরিবেশগত উদ্দীপক মানুষের গুরুমস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে আর শারীরক্রিয়াকে নিয়ত প্রভাবিত করে। আই. পি. পাভলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে গুরুমস্তিষ্ক কেবল মাত্র বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থি ও আন্তর্যন্ত্রকে পরিচালিত করে তাই নয়, মানুষের সামগ্রিক আচরণ ও ব্যবহারেরও নিয়ামক এই গুরুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কে ইন্দ্রিয় মারফত বহির্জগতের প্রতিফলন থেকে সমস্ত রকমের মনন-ক্রিয়ার এমনকি চৈতন্যেরও উদ্ভব। মানব চরিত্র বা তার ব্যক্তিত্বের জটিলতা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে গেলে কেবল মাত্র সহজাত প্রবৃত্তির দোহাই পাড়লে চলবে না। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশের প্রভাবকে স্বীকার করতেই হবে।

মানুষের চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি—এ সমস্তই তার সামাজিক অভিজ্ঞতার ফল। শুধু মস্তিষ্ককোষের স্পন্দন দিয়ে এই চিন্তাভাবনার হদিস মেলে না। বিশেষ স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সামাজিক অবস্থানের ওপরই এই সব চিন্তা-ভাবনা অনুভূতি নির্ভর করে। মোটামুটি মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতাই সামাজিক-অভিজ্ঞতা। মনস্তত্ত্ব সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা নিরূপিত।

স্ত্রী পুরুষের আঙ্গিক ও শারীর-ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্যে তাদের মানসিকতার তারতম্য কতদূর হতে পারে দেখা যাক। একথা সত্যি যে দেহের পরিণাম-ক্রিয়া পুরুষের তুলনায় মেয়েদের কিছু কম, সন্তান ধারণ ও পালনের জন্য মেয়েদের শারীরক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কায়িক শ্রমে সাধারণতঃ পুরুষেরা মেয়েদের থেকে বেশি দক্ষ। এর দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র ও মানসিকতার কোন গুরুতর পার্থক্য ঘটতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না অথচ 'গুরুতর-পার্থক্য' আছে—এযাবত আমরা এই রকমই শুনে আসছি। গুরুতর কথাটি আমি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করছি। কাব্য-উপন্যাস-গল্পে নারীকে যতই কমনীয় ও রমনীয় রূপে চিত্রিত করা হোক না কেন, আসলে কিন্তু বল-বীর্য-সাহসিকতা ইত্যাদি পুরুষসুলভ গুণের অধিকারী হওয়া অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়—এই কথাটাই নানাভাবে প্রচার করা হয়েছে। গুরুতর পার্থক্য বলতে পুরুষের তুলনায় নারীর চারিত্রিক ও মানসিক অপকর্ষতাই এইসব লেখক ও মনস্তাত্ত্বিকরা বলতে চেয়েছেন। পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তি ও চারিত্রিক বলে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেই এ যাবৎ আধিপত্য করে এসেছে। দর্শন-বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও পুরুষের অবদানই বেশি চোখে পড়ে। নারী-পুরুষের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে সর্বব্যাপারে সর্ববিষয়ে পুরুষ নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এই কথাটাই বারবার বলা হয়েছে। পশ্চিম-ইউরোপ বা আমেরিকার সমাজ-জীবনের দিকে তাকালে অবশ্য আপাতঃ দৃষ্টিতে পুরুষ প্রাধান্যর কথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র জৈব কারণ দ্বারা নির্ণিত হয় একথা কী সত্য? মাতাপুত্র, ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধুবান্ধবীর মধ্যে যে কেবল জৈব সম্পর্ক বিদ্যমান একথা গোঁড়া ফ্রয়েডপন্থী ছাড়া আর কেউই বলবেন না। এমন কি রোমান্টিক প্রেমও জৈব সম্পর্কের দ্বারা নিরূপিত হয় না। আমরা জানি মানুষের রোমান্টিক প্রেমের জন্ম এই সেদিন হয়েছে। আদিম সমাজে এ হৃদয়বৃত্তি অজানা ছিল। মোট কথা, স্ত্রী-পুরুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র বা মানসিকতার কোন পার্থক্যই বিধিদত্ত জন্মগত ও শাশ্বত এবং তাদের মধ্যেকার, জৈব সম্পর্ক সঞ্জাত বলে আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে না।২

আপেক্ষিক বিচারে পুরুষ নারীর থেকে বেশি বুদ্ধিমান, এ কথা প্রমাণ করা যায় না। বরঞ্চ নানারকমের কল-কারাখানা ও অফিসে নিয়োজিত মেয়েদের কর্মকুশলতার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলা চলে যে তারা অনেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ তো বটেই, কিছু কিছু বিষয়ে বেশি অগ্রসরও বলা চলে।

যেমন হাজার হাজার বছর ধরে কোন কোন দেশে সমাজব্যবস্থায় পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে, তেমনি বহু পুরনো আদিম সমাজে নারীকেও বলীয়ান ও মহীয়ান বলে ভাবা হত।৩ নরনারীর সম্পর্ক ও তাদের চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক উৎপাদনের ও বন্টন ব্যবস্থায় তাদের পারস্পরিক অংশ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল—একথা ইতিহাস সম্মত।৪ সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন আদিম কৃষি-নির্ভর সমাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাই ছিলেন প্রধান উৎপাদক। তাঁরাই চাষ করতেন, খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতেন, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও বস্ত্রবয়ন

(১) জে. ফার্স্ট—'দি নিউরটিক'—প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪।

(২) 'লিওনাটাইলার'—সাইকলজি অফ হিউম্যান ডিফারেন্সেস —চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(৩) রবার্ট ব্রিফো'—দি মাদার্স, পৃঃ ৩৬০।

(৪) তুলনীয়ঃ 'বার্নাড স্টার্ন'—এঙ্গেল্‌স অন দি ফ্যামিলি, সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি। (দ্বিতীয় খণ্ডঃ ১২ [১৯৪৮] পৃঃ ৪২)

করতেন এবং শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্বও ছিল এঁদের হাতে। সর্বপ্রকার সামাজিক কাজে এঁদের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। এঁরা ছিলেন পরিবারের প্রধান, ধর্মকার্যের পরিচালক এবং সম্পত্তির মালিক। এক কথায়, সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান।

কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটল। উৎপাদন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব এল পুরুষের হাতে। মেয়েদের রাজনৈতিক, আইনগত ও ধর্মগত অধিকার ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হল। বিবাহবিধি পরিবর্তিত করা হল এবং নৈতিক মানদণ্ডের পুনর্মূল্যায়ন করা হল। বিজেতার ফতোয়া নির্দেশ দিল যে বিজিত (নারী), শারীরিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে পুরুষের থেকে হীন। সুতরাং স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হল সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় তাদের স্থান থাকবে তলায়। বাইবেলের আদম-ইভের গল্প পুরুষ-দম্ভের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নারী-পুরুষের, চরিত্র ও মানসিকতার তারতম্য, পুরুষের উৎকর্ষ ও নারীর অপকর্ষ, পুরুষ প্রধান সমাজের বদ্ধমূল ধারণা। উৎপাদন ব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন ব্যাপারে সমান সুযোগসুবিধা পেলে এ দম্ভোক্তি যে কত অসার তা প্রতিপন্ন করা কঠিন নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার সমস্ত ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমকক্ষতা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

যদিও ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থায় অপরিহার্য রূপে নারীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে তবুও নীতিগতভাবে পুরুষ প্রাধান্যের অবসান ঘটে নি। প্রাক-ভিক্টোরীয় যুগের তুলনায় মেয়েদের কিছুটা উন্নতি ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করব না। বিবাহবিচ্ছেদ মেয়েদের প্রয়োজনে অনেকটা সহজ হয়েছে, তারা ভোটাধিকার পেয়েছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারেও কতকটা সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে এখনও নারী পুরুষের দ্বারা শোষিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত। রাজনৈতিক কারণে নারী চরিত্রের অপকর্ষ প্রচার করা হয়েছে অনেক পুঁথি পুস্তক ও প্রবন্ধে। জার্মান লেখক এমিল লুডউইগের 'ওম্যান এ ভিণ্ডিকেশান—খেয়ালী রচনা নয়। পরবর্তী-যুগের নাৎসী প্রচারে এই পুস্তকের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশেও মেয়েরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক কোনও ব্যাপারেই পুরুষের সমান মর্যাদা পান না। একই কাজের জন্য মেয়েদের পুরুষদের তুলনায় কম মাইনে দিয়ে আমেরিকার শিল্পপতিরা ১৯৫০ সালে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার বেশি লাভ করেছেন।

ইতালি, রোম, জেনোয়া, টিউরিন প্রভৃতি শহরে শ্রমিক মহিলারা অনেক সময়েই বিবাহের কথা গোপন রাখেন। কেননা বিয়ে করলেই খেশারত দিতে হয় অথবা ছাঁটাই-এর নোটিশ পেতে হয়। [তুলনীয়ঃ 'নিউ টাইমস্' একাদশ সংখ্যা—১৯৬১]

টেক্সাস, ফ্লোরিডা, নেভেডা, ক্যালিফোর্নিয়া ইত্যাদি আমেরিকার অনেকগুলি রাষ্ট্রে স্ত্রী-পুরুষে ভেদনীতি অতি উৎকটভাবে প্রচলিত। এখানে শ্রেণীগতভাবে মেয়েরা নিকৃষ্ট বিবেচিত হন। এখানে মেয়েদের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগসুবিধা ও ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করে চুয়াল্লিশটি পীড়নমূলক আইন প্রচলিত আছে। বর্তমানে টেক্সাসের বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠান 'ফেডারেশন অফ বিসনেস অ্যাণ্ড প্রফেসনাল উইমেন্স্ ক্লাবের' নেতৃত্বে মেয়েদের অবমাননা-কর ও বৈষম্যমূলক বিধিনিষেধগুলি বাতিল করে সংবিধানের সংশোধন দাবি করে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে মেয়েদের এতই নিকৃষ্ট ভাবা হয় যে, সম্প্রতি সেখানকার 'পায়োনিয়ার' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—"আর উইমেন পিপল?"—হল যার শিরোনামা। [তুলনীয়—নিউ টাইমস্ একাদশ সংখ্যা—১৯৬১।]

রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই সব রাষ্ট্রে মেয়েদের স্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমেরিকার কংগ্রেসে স্ত্রী-সভ্য-সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। বিলেতের পার্লামেন্টেও নারী সভ্যসংখ্যা নগণ্য। এদিক দিয়ে ভারতবর্ষ বরঞ্চ অনেক এগিয়ে আছে। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন

সভাগুলিতে নারী সভ্যার সংখ্যা খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নারী জাতির অনগ্রসরতার কারণ নিহিত র'য়েছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে, মেয়েদের অন্তর্নিহিত নিকৃষ্টতার মধ্যে নয়।

কথা উঠতে পারে যে মেয়েদের অগ্রগামিতার বাধাটা কোথায়? তাদের ঠেকিয়ে রাখছে কে? সব সময় যে রাষ্ট্র আইনের পাঁচিল তুলে মেয়েদের গতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে তা নয়। এই সব দেশের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের নারীর মানসিকতা ও চরিত্রের অপকর্ষ প্রচার এই ভ্রান্ত ধারণাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করছে। বিশেষ করে পুরুষের যে কালে এতে লাভের সম্ভাবনাই বেশি।

মেয়ে-পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে সচরাচর যে সকল পার্থক্য নজরে পড়ে সেগুলি মৌলিক বা শাশ্বত নয়। সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষের বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকারের। উচ্চবিত্ত ও বস্তিবাসী শ্রমজীবী সমাজে নারীর মর্যাদা দাবি ও প্রাধান্য মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের থেকে অনেক বেশি। মধ্যবিত্ত সমাজেও যেখানে স্ত্রীকে রুজি-রোজগারের জন্য বাইরে যেতে ও পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে স্বামীর কর্তৃত্বাভিলাষ অনেকটা সঙ্কুচিত।

মানুষ—সে নারী বা পুরুষ যাই হোক, কেবলমাত্র 'বায়োলজিকাল বিইং' নয়, প্রধানতঃ সামাজিক জীব। সমাজব্যবস্থায় তার বিশেষ অবস্থানের ওপরই তার চারিত্রিক ও মানসিক গুণাগুণ নির্ভর করে। ব্রীড়া, সঙ্কোচ, অতি নমনীয়তা, অতি লজ্জাশীলতা একদিন নারী চরিত্রের মহামূল্যবান ভূষণ মনে করা হত। আজ উৎপাদন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী আধুনিক মেয়েদের মধ্যে ওই গুণগুলির যথাযথ প্রকাশ না দেখতে পেলে আমরা বিস্মিত হই কী? এতদিন নারীকে শুধু সহধর্মিণীরূপে পুরুষ কল্পনা করে এসেছে। আজ তাকে সহকর্মিণীরূপে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছে। নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেবার তাগিদে মেয়েদের চরিত্রে ও মানসিকতায় নতুনতর গুণের বিকাশ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত "পৌরুষ"-এর উন্মেষ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সনাতনপন্থীরা যতই আতঙ্কিত হোন না কেন, এ পরিবর্তন তাঁরা আট-কাতে পারছেন না। পুরনো মনস্তাত্ত্বিকরা নারী পুরুষের মধ্যে সহজাত জৈবকারণ সম্ভূত মানসিক বৈষম্যের যে সীমা টেনে রেখেছিলেন—আজ তা লুপ্ত হতে বসেছে।

পাভলভের মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞান এই জন্মগত বা সহজাত বৈষম্য যে অবাস্তব নানা দিক দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। [তুলনীয়ঃ কে, এম, বিকভ, নিউ ডেটা অন দি ফিজিওলজি এ্যাণ্ড প্যাথলজি অন দি সেরেব্রাল করটেক্স—(১৯৫৩)] হ্যারি কে, ওয়েলস্‌এর এই উদ্ধৃতিটি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি।

"দি ডক্‌ট্রিন অফ ইন্নেট সুপিরিয়রিটি অফ মেন ওভার উইমেন, মেল সুপিরিয়রিটি ইজ এ মোস্ট এফেক্‌টিভ কমপ্লিমেণ্ট টু দি ডক্‌ট্রিন্‌স্‌ অফ ক্লাশ, ন্যাশনাল অ্যাণ্ড রেশিয়াল সুপিরিয়রিটি।"

পাভলভ-বিজ্ঞানের তথ্যপ্রমাণ দিয়ে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলেঃ "এ সাইকলজি হুইচ মেকস্‌ ইনবর্ন ইনস্‌-টিঙ্কট্‌স্‌ সেন্ট্রাল, অর ওয়ান থ্যাট স্ট্রেসেস ইন্নেট ইনটেলি-জেন্স আই, কিউ, সারভস দি পারপস।...অল্‌ পিপল্‌স্‌ আর এনডাউড উইথ দি সেম্‌ এসেনসিয়াল নার্ভাস এ্যাপা-রেটাস্‌ ফর দি ডেভলপমেণ্ট অফ কনসাসনেস্‌ অ্যাণ্ড হিউম্যান নেচার জেনারেলি। অ্যাকর্ডিং টু দিস সায়েন্টিফিক্‌ সাইকলজি, দেয়ার আর নো ইন্নেট ডিফারেন্সেস্‌ ইন দি হায়ার নার্ভাস মেকানিজম্‌স্‌ অফ ক্লাশেস, রেসেস, নেশনস্‌ অর দি সেক্সেস।"

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পশ্চিম ইউরোপে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে শিল্প-বিজ্ঞান-দর্শন ও অন্যান্য সৃজনমূলক কাজে পুরুষের অবদান মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। এর কারণ এই নয় যে পুরুষ জন্মগত ও বিধিদত্ত এমন ক্ষমতার অধিকারী যা নারীর মধ্যে নেই। আসল কারণ পুরুষের অবাধ সুযোগ সুবিধা। এযাবৎ মেয়েদের প্রধানতঃ গৃহস্থালির কাজে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে

নারী সম্পর্কে পুরুষের অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের জীব! হয় দেবী কল্পনা ক'রে কাব্য কুসুমের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে, অথবা নারীদের নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব মনে করে অনুকম্পার হাসি দিয়ে তাদের মন ভোলাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছায়া-ছবি রেডিও বা সাময়িকপত্রিকায় মেয়েদের এই চিত্র হামেশাই নজরে পড়ে। তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যে আধুনিক মেয়ের যে ছবি আঁকা হয় এবং ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপনে নারীদেহকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়, তা এতই ন্যক্কারজনক যে, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নৈতিক চরিত্রের মান নির্ণয়েও পুরুষ ও নারীর ভিন্ন ব্যবস্থা। সতীত্ব নামক গুণটি নারীর বেলায় অপরিহার্য, পুরুষের বেলায় নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলা মার্জনীয়। মধ্যবিত্ত সমাজে যে কোন কারণে একবার পদস্খলন ঘটলে নারীকে একেবারে তলিয়ে যেতে হয়। পতিতার সংখ্যা বাড়ে। পক্ষান্তরে পুরুষকে এর জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। এটা সম্ভব হয়েছে সমাজে পুরুষ প্রাধান্যর জন্য, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পুরুষপ্রধান সমাজে সব দিক দিয়েই নারীর সুযোগ সুবিধা কম, কাজেই তাদের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ব'লে মনে হয়। আবার এই অনগ্রসরতার জন্য মনোস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে অপকর্ষের অপবাদ সইতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নারী পুরুষের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে নরনারীর সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। এ কথা সবারই জানা যে শোষিতই কেবল শোষককে ভয় পায় না —শোষকেরও মনের তলায় শোষিত সম্পর্কে থাকে নিদারুণ ভীতি। তাই প্রেম ও বিশ্বাসের পাশাপাশি দেখতে পাই অবিশ্বাস ও ভয়ের ছায়া, সামাজিক বৈপরীত্যের মানসিক প্রতিফলন। শুধু সংবিধানের সংস্কার সাধন করে মেয়েদের ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া কঠিন। সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া যায় না বলেই মনে হয়।

অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তন ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে মনোজগতের পরিবর্তন ঘটবে, এমন নয়। মানসিক পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগতে পারে। বিশেষ করে ধারণা যেখানে বদ্ধমূল, অভ্যাসিক সংস্কার হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধুমাত্র পরিবেশের পরিবর্তনেই ধারণা দূর হতে চায় না মানসিক বিপ্লব সাধিত হতে দেরি হয়। তাই সোভিয়েত দেশেও দেখতে পাই ক্লারা জেটকিন ফুৎসেভার সংখ্যা খুব বেশী নয়। নরনারীর সম্পর্ক ও পরিবার জীবন সব ক্ষেত্রেই পুরোপুরি সুস্থ নয়। বিবাহবিচ্ছেদ ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় কম হলেও, ঘটছে।

একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সুকুমার হৃদয়-বৃত্তিগুলো মেয়েদের মধ্যে বেশী আছে এবং নারী পুরুষের পারস্পারিক আকর্ষণ ও রোমান্টিক প্রেমসঞ্চারে বর্তমানে এই হৃদয়বৃত্তিগুলোর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে— আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করি। তা' বলে মনে করি না, এই বৃত্তিগুলো পুরোপুরি বায়োলজিক্যাল কারণ-সঞ্জাত। নারীর সন্তান পালনের ভূমিকা ও তজ্জনিত বিশেষ পরিবেশ তাকে কতকগুলো বিশেষ বৃত্তির অধিকারী করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই কথাই বলবে। এ ছাড়াও এই বৃত্তিগুলোর উন্মেষের মূলে রয়েছে তার—পরনির্ভরতা। পুরুষ প্রধান সমাজে রুজি-রোজগারের ও অন্যান্য ব্যাপারে সুযোগসুবিধা মেয়েদের কম থাকার দরুন কতকগুলো পুরুষ মনোরঞ্জনকারী চিত্তবৃত্তির উন্মেষ খুবই স্বাভাবিক। বায়োলজিক্যাল তত্ত্ব-বিশ্বাসীরা প্রাণীজগতের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন কিছু কিছু ইতর প্রাণী আছে, যাদের মেয়ে প্রাণীরা শক্তি ও সামর্থ্যে পুরুষ প্রাণীদের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং আকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের ভূমিকা নিয়েছে পুরুষপ্রাণী। লাকাদিভ দ্বীপে এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দু-এক জায়গায় যেখানে এখনও মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে দেখা যায় যে—বহির্জগতের কাজকর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তি চালনা নারীরাই করছেন। কাজেই মনে হয় নারীর অন্তর্মুখীনতা বা ঐচ্ছিক পারিবারিক গণ্ডীবদ্ধতার মূলে রয়েছে পরিবেশ ও সংস্কারের প্রভাব। একটা ধারণা বহুদিন ধরে চালু থাকলে সেটা মানুষ নির্বিচারে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সেই রকমই হয়েছে। অবস্থা বদলাতে চাই সমাজ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও প্রচার। চাই শিক্ষার বিস্তার।

পীয়ের জেনেটের ভাববাদ সম্পর্কে

আই, পি, পাভলভ

[আই, পি, পাভলভ সারাজীবন রহস্যবাদ (mysticism), সর্বপ্রাণবাদ (animism), দ্বয়বাদ (dualism)-এর বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন অদ্বয়বস্তুবাদী। শেরিংটন, ল্যাসলে, কোহেলার সকলের অবৈজ্ঞানিক মতবাদকে নানাভাবে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেছেন। চৈতন্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাকৃতবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও তিনি সহ্য করতেন না। আজও বহু বিজ্ঞানী মানসিকতার ও চৈতন্যের উন্মেষ ব্যাখ্যায় নানা রকম রহস্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি আমদানি করে পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের জগতে ভাববাদকে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন; মনোবিজ্ঞানের প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে চাইছেন। সৎ-বিজ্ঞানীদের এবিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

পাভলভ প্রতি বুধবার সহকর্মীদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনাসভা চালাতেন। পীয়ের জেনেট সম্পর্কে এই উক্তি এমনি এক সভাতেই করেছিলেন তিনি।

জেনেট ফরাসী দেশের লোক, পাভলভ ও ফ্রয়েডের সমসাময়িক। হিস্টিরিয়া সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ও মতামত চিকিৎসাজগতে সুবিদিত। চৈতন্যের বিষঙ্গ (dissociation of consciousness) কথাটি তাঁরই আবিষ্কার।

এখানে পাভলভ ভ্রান্তি রোগের (delusion) কথা তুলেছেন। ভ্রান্তি, প্রচ্ছন্নতা, মায়া (delusion, obsession, hallucination) ইত্যাদির শারীরবৃত্তমূলক ব্যাখ্যা দিতে পাভলভই প্রথম সক্ষম হয়েছেন। ভ্রান্তি রোগে যে ভুগছে, অন্য সবদিকে সে স্বাভাবিক থাকতে পারে। হয়তো শুধু অফিসে যেতে চায় না। সেখানকার সহকর্মীরা তাকে বিপদে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে। অথবা বলতে পারে স্ত্রী তাকে চায়ের সঙ্গে বিষ দেবার মতলব করছে। যথেষ্ট অনুসন্ধান না করে তার অভিযোগ মিথ্যা বলে ভাবা কঠিন। তার সহকর্মীরা দেখা গেল তার শুভানুধ্যায়ী; তার স্ত্রী তাকে সত্যিই ভালোবাসে। কোনরকম যুক্তির অবতারণা করে তাকে তার ভ্রান্তি থেকে বিচ্যুত করা যায় না। কেন এমন ঘটে?

সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কে উত্তেজনা ও নিস্তেজনা সবল ও সুসমঞ্জস। অল্পায়াসেই একে অপরের স্থান অধিকার করতে পারে। তাই বহির্জগতের নানাবিধ জটিল, শক্তিশালী, বিপরীতধর্মী উদ্দীপনা এবং এসবের মাত্রাগত ও গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে মানুষ।

মস্তিষ্ককোষ রোগে বা ঐরকম কোন কারণে যদি দুর্বল হয়ে পড়ে. তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম। আয়ত্তের বাইরে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলে মস্তিষ্ক কোষে প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা (protective inhibition) নেমে আসে। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি অনেকগুলি স্বল্পস্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়। হিপনটিক বা সম্মোহিত অবস্থাও দেখা দেয়। এইসময় মস্তিষ্কে উদ্দীপনার স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

স্বাভাবিক নিয়মে উদ্দীপকের মাত্রাগত পরিবর্তনের সঙ্গে পরাবর্তেও মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে। পাঁচমাত্রার উদ্দীপকে যদি সাত ফোঁটা লালা ঝরে থাকে, তবে দশমাত্রায় ঝরবে চোদ্দ ফোঁটা, কুড়ি মাত্রায় আঠাশ ফোঁটা ইত্যাদি। সোজা গাণিতিক নিয়ম। পূর্ববর্ণিত সম্মোহিত অবস্থায় (মনে রাখতে হবে বাইরের কোন কিছুর সাহায্যে এ অবস্থা আনা হচ্ছে না) পরাবর্তের গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে। সম্মোহিত অবস্থার বিভিন্ন ধাপ আছে, আর প্রত্যেকটি ধাপেই মস্তিষ্ক ক্রিয়ার বিশেষত্ব নজরে পড়ে। প্রথমে আসে সমকক্ষতার ধাপ (equalising phase)।

ঐ অবস্থায় ছোট বড় সকল মাত্রার উদ্দীপকেরই ফলাফল এক। পাঁচ মাত্রার আর কুড়ি মাত্রার উদ্দীপক সমপরিমাণ লালা ঝরাবে। পরের ধাপে স্বল্প মাত্রার উদ্দীপক বেশীমাত্রার প্রতিক্রিয়া আর বেশী মাত্রার উদ্দীপকে স্বল্প মাত্রার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। পাঁচ মাত্রার উদ্দীপক নিয়ে আসবে আঠাশ ফোঁটা লালা আর কুড়ি মাত্রার উদ্দীপক দিয়ে পাওয়া যাবে মাত্র সাত ফোঁটা। এই ধাপকে বলা হয়—আপাতঃ অদ্ভুত বা স্ববিরোধী অবস্থা (paradox) পরের ধাপে পরাবর্তের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ভাবি এক আর হয় অন্য। যে উদ্দীপকে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হওয়া উচিত সেই উদ্দীপকে মস্তিষ্ক নিস্তেজিত হয়ে পড়ে। কিংবা এর উল্টোটাও ঘটে। এই ধাপই এই লেখায় বর্ণিত অতি-অদ্ভুত বা আপাতঃ-অতি-স্ব-বিরোধী ধাপ (ultra-paradoxical phase)।

ভ্রান্তিরোগে মস্তিষ্কে আরও একটি বিশৃঙ্খলা ঘটে। মস্তিষ্কের এক বা একাধিক জায়গা উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না; যে ফিরে আসাটা হল মস্তিষ্ক কোষের সহজ ধর্ম। উদ্দীপ্ত অবস্থাতেই তারা একরকম অনড় (inert) হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের অন্যত্র অথচ উত্তেজনা-নিস্তেজনার জোয়ারভাঁটা খেলে যাচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই। ধরুন কোনও একসময়ে রাস্তায় গুণ্ডার হাতে পড়ে একজনের ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল, ফলে মস্তিষ্কের কতকগুলি জায়গায় ঘটে উত্তেজনা। তখন থেকে যদি রাস্তায় বেরুতে গেলেই তাঁর ভয় হয়, বুঝতে হবে ঐ উত্তেজিত কোষগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে নি; অনড় হয়ে রয়েছে। আর চারপাশে একটা নিস্তেজনার গণ্ডি (inhibitory zone) সৃষ্টি করে মস্তিষ্কের অন্য অংশের উদ্দীপনা-তরঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাই হাজার যুক্তি-বিবেচনা পেশ করলেও ঐ অনড় জায়গা নিষ্ক্রিয়ই থেকে যাচ্ছে। কোন ফল হচ্ছে না]

আমি বর্তমানে পীয়ের জেনেটের সর্বশেষ গ্রন্থ "বোধ-শক্তির উৎস" পড়ছি। পীয়ের জেনেট একজন অসাধারণ মানুষ। তিনি শারীরবিদ্ নন, মনোবিদ্ এবং বিখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আগামী বুধবার আমি তাঁর বইয়ের সারাংশ নিয়ে আলোচনা করব। বইটির যুক্তি এবং বিশ্লেষণ খুবই আকর্ষণীয়। এই বইয়ে উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার শারীরবৃত্ত ও মনোবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই কারণে এই বিষয়ে আরও বেশী সময় ধরে আমি আলোচনা করব।

মনোবিদ্ পীয়ের জেনেটের বিরুদ্ধে আমি এক প্রচণ্ড লড়াই চালাচ্ছি। পরবর্তী বক্তৃতায় তাঁর মতকে বিধ্বস্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞানী জেনেট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তি। অনেক রোগীর চিত্তাকর্ষক এবং প্রয়োজনীয় কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছেন। আমি নিশ্চিত যে স্নায়ুবিজ্ঞানী জেনেট বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ শারীরবিদ্‌দের উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার ফলে মনোবিদ্‌রূপে তিনি কখনই গ্রাহ্য হবেন না।

তিনি তাঁর রচনায় দুটী রোগীর রোগ ইতিহাসের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রথমটী নিম্নরূপ।

এক ভদ্রমহিলা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর নিদারুণ ক্লান্ত অবস্থায় রেলপথে গন্তব্যস্থানে চলেছিলেন। 'তিনি বিপরীত দিকে চলেছেন' এই ভিত্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা সহযাত্রীদের সান্ত্বনা সত্ত্বেও সারাপথ তাঁকে পীড়িত করেছিল।

এর অর্থ কি? এই বিকারতত্ত্বীয় ঘটনাটি একরকম আচ্ছন্নতার (obsession) নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক, একজন রোগী চায় সকলেই তাকে সম্মান করুক। কিন্তু বিনা কারণেই তার ধারণা তাকে অপমান করা হচ্ছে। অথবা মনে করুন, সে একলা এবং স্বতন্ত্র থাকতে চায়, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ঘরে আর কেউ রয়েছে। আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি,একে বলে মস্তিষ্কের 'আপাতঃ-অতি-স্ব-বিরোধী অবস্থা' (ultra-paradoxical phase)। অত্যদ্ভুত স্বকপোলকল্পনা! এই কল্পনা বিরোধিতার শ্রেণীভুক্ত। কল্পনাটি এক মৌল উদ্দীপকের উত্তেজনার ফল। উদ্দীপকটি হল আমি একটি নির্দিষ্ট দিকে চলেছি।

এরপর আসছে সম্মোহিত অবস্থা—উদ্দীপকের (এক্ষেত্রে গাড়ির আওয়াজের) এক ঘেয়েমি যার সৃজক। তা'ছাড়া সন্তানজন্ম-জনিত কষ্টের ফলে এসেছে স্নায়ুসংস্থায় ক্লান্তি ও নিস্তেজনা। এই সমস্ত কিছু 'আপাতঃ-অতি-স্ব-বিরোধিতা' অথবা মূলধারণার বিকৃতির সূচনা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'আমি একলা' এই ধারণাটি পরিবর্তিত হল 'আমি একলা নই'—এই ধারণায়। 'আমি সম্মানিত হচ্ছি বা হতে চাই' এই চিন্তা পর্যবসিত হল এর বিপরীত চিন্তায়—'আমি অসম্মানিত হচ্ছি। 'আমি ঠিক দিকে যাচ্ছি' এই চিন্তাটিও বিপরীত রূপ পরিগ্রহ করল। পীয়ের জেনেটের কাছে লেখা খোলা চিঠিতে আমি এই ঘটনার ব্যাখ্যা করেছিলাম। এ এক পুরনো, বৈশিষ্ট্যহীন গল্প।

দ্বিতীয় রোগীর কাহিনীটি আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এই কাহিনীটি একজন ফরাসী অফিসারের। যুদ্ধে তাঁর মাথার খুলির পেছনদিকে আঘাত লেগেছিল। গুরু মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগের মধ্য দিয়ে গিয়ে বিপরীতদিকে বুলেটটি বিদ্ধ হয়েছিল। কোনও কারণে বুলেটটিকে অপসারিত করা সম্ভব হয় নি।

অফিসারটি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারালেন। পরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা হল। তিনি আবার দেখতে পেলেন কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলেন না। একেই 'মাঙ্ক-বর্ণিত অন্ধতা' বলে। পরবর্তীকালে তিনি যা দেখতেন, তার ঠিক মত নাম বলতে ও দৃষ্টবস্তু সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন। মানুষকে মানুষ বলে, টেবিলকে টেবিল বলে চিনতে পারলেন। এরপর তাঁর দর্শনগত উপলব্ধি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ফল হল এই রকম। আমি জেনেটের রচনা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি—রোগীটি একটি সৈনিকের হাতে ভর দিয়ে আমার আলোচনাকক্ষে প্রবেশ করলেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যের সাহায্য ছাড়া তিনি একপাও হাঁটতে পারেন না। তিনি আমাকে চিনতে পেরে সৌজন্য সহকারে, সঠিকভাবে অভিনন্দন জানালেন এবং একটি আর্মচেয়ারে বসে অভিযোগের সুরে বলতে শুরু করলেন—"আমার দুঃখের শেষ নেই, কারণ পৃথিবীতে আমার অবস্থান-নির্ণয়ের ক্ষমতা আমি হারিয়েছি, আমি কোথায়, তা আমি জানি না, এই বলে তাঁর বুকের ভার লাঘব করলেন। হুবহু এই কথাগুলোই তিনি বলেছিলেন। সত্যই নিজের অবস্থান-নির্ণয়ের ক্ষমতা তিনি সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন।

এটি একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা। কিন্তু এর ব্যাখ্যা কি? আমাদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে আমি দু'টি অনুমান করেছি। স্পষ্টত ব্যাপারটি মস্তিষ্কের অক্‌সিপিট্যাল ভাগ-সংক্রান্ত এবং পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে রোগীর দৃষ্টি সম্পর্কিত।

'রিবাসের' (পর্যবেক্ষণাধীন কুকুর) মধ্যে আমরা যা লক্ষ্য করেছিলাম, সেই একই জিনিস রোগীর দৃষ্টি সংক্রান্ত এলাকায় ঘটেছে। এই এলাকা এত বেশী নিস্তেজিত হয়েছে যে, এক সঙ্গে দুটি উদ্দীপক সহ্য করতে পারছে না। মনে করে দেখুন, 'রিবাস'ও একাধিক শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরী করতে পারত না—বলিষ্ঠতর পরাবর্তটী দুর্বলটিকে ধ্বংস করে দিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আত্মরক্ষামূলক পরাবর্তটী এ্যাসিড-জনিত পরাবর্তকে ধ্বংস করেছিল, আবার অ্যাসিড-কৃত পরাবর্ত্ত পরিপাক যন্ত্রের পরাবর্ত্তকে নষ্ট করেছিল।

মস্তিষ্কের দর্শনস্তরে উত্তেজনাপ্রবণতা এত কম হয়েছে যে, কোন উদ্দীপক প্রযুক্ত করলে তার কর্মক্ষমতা একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকছে। সেই অবস্থায় অন্যবিন্দু-গুলির অস্তিত্ব নেই বলেই মনে হচ্ছে। ফলে রোগী একটিমাত্র মানুষ বা বস্তুকে দেখছেন, তার সঙ্গে অন্যকিছু উপলব্ধি করতে পারছেন না। কেননা স্থান সম্পর্কে তাঁর ধারণা নষ্ট হয়ে গেছে। কোনও মুহূর্তে যে বিন্দুটি উদ্দীপিত হচ্ছে, সেই বিন্দুটিতেই সমস্ত অনুভূতি ও ধারণা আবদ্ধ থাকছে। পরে তার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকছে না। এই কারণেই রোগী মনে করছেন, তিনি 'দুনিয়ায় হারিয়ে গেছেন।'

এই অফিসারের মস্তিষ্কে দৃষ্টিক্ষমতাজাত স্মৃতিচিহ্নের সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ অবলোপ গবেষণার উপযুক্ত বিষয়। শুধু-

মাত্র বিদ্যমান উদ্দীপকই তাঁকে প্রভাবিত করছে ; যখন দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হচ্ছে একটি জায়গায়, ঐ বিশ্লেষকের অন্যান্য অংশে নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই উদ্দীপনার বাকীটুকু কাজে লাগছে না, তাঁর চেতনা থেকে তা যেন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই থেকেই তাঁর ধারণা হচ্ছে তিনি 'এই বিশ্বে হারিয়ে গেছেন।'

আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি এমন-কিছু এবার আমি বলব। আগামী বুধবার আমি পীয়ের জেনেটের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে আক্রমণ চালাব। এখন আমি তাঁর বিষয়ে অল্পকিছু বলতে চাই।

তিনি সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী (animist)। এমন একটি বিশেষ বস্তুতে তাঁর বিশ্বাস, যা অজ্ঞেয় এবং কোনও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন নয়। তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি উগ্র ফরাসী দার্শনিক বাঁর্গসঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি লিখেছেন : প্রকৃতি কেমন করে চোখের মতন এমন অলৌকিক অঙ্গ তৈরি করল, তা বোঝাবার জন্য বাঁর্গসঁ আমাদের ভারি সুন্দর এক উদাহরণ দিয়েছেন। চোখকে আমরা খুব জটিল অঙ্গ বলে মনে করি। আমাদের ধারণা, একে বুঝতে গেলে, একের পর এক তথ্য স্তূপীকৃত করে তাদের নানা উপায়ে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু আমার এই হাতটা যদি তুলতে চাই, এর সাহায্যে কোন কাজ করতে চাই, তাহলে স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণের দরকার হয় কি? প্রয়োজন শুধু ইচ্ছাশক্তির, তাহলেই সবকিছু যথাযথভাবে আপনাথেকেই ঘটে যায়। প্রাণসত্তা-আলোর জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, আলোর পরশ চেয়েছিল। প্রাণসত্তার সেই 'ইচ্ছাই' নয়নরূপ পরিগ্রহ করেছে!

স্পষ্টভাষাতেই তিনি বলেছেন—'ইচ্ছাই চোখের রূপ নিয়েছে ইচ্ছার আছে সৃজনী ক্ষমতা, ইচ্ছা মহাশক্তিশালী।'

আরও বলেছেন—'আদিম এই সৃজনীক্ষমতা আমরা অনেকখানিই আজ হারিয়েছি, তবু এখনও কল্পনায় তার আংশিক প্রয়োগ আমরা করে থাকি।'

জিজ্ঞাস্য এই—তিনি কি আমাদের মত মানুষ? আমরা কি তাঁর মতে সায় দিতে পারি? না, কখনই না।

[১৯৩৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর সভায়—পাভলভের কথাবার্তার সারাংশ। উশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরাজী থেকে অনূদিত।]

বিবাহকালীন মনোবিকার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য

ডাঃ অজিতকুমার দেব, এম. এসসি,
এম. বি (কলি,) ডি. পি, এম (লণ্ডন)

এ প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে অবাক হ'বেন না তাঁরাই, যাঁদের কাছে এই ধরনের রোগী আসে মধ্যে মধ্যে। বিবাহের পূর্বে বিভিন্ন রকমের রঙিন ছবির সঙ্গে মিশে থাকে নানা দুর্ভাবনা এবং দুশ্চিন্তা। যাদের বিবাহ হয় সাবেকী প্রথায় তাদের বিষয় প্রথমে আলোচনা করা যাক। বর-বধূ পরস্পরকে বোঝার চেষ্টায় যখন অধীর সে সময়ে অনেক ক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠার আতিশয্যে তাদের বোঝাপড়া বহুলাংশে ব্যাহত হয়; প্রথম সাক্ষাতেই চরম আনন্দের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে পর; যার মনোবল অপেক্ষাকৃত কম তার আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। তখন প্রায়ই সে ব্যক্তি অভিযোগ করে, যার সঙ্গে সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে সে বোধ হয় অন্য কাকেও ভালবাসে—নাহলে এ অঘটন ঘটলো কেন? বিবাহের সম্বন্ধ একদিনে হয় না। এসম্বন্ধের মধ্যে যে নানা জটিলতা আছে সে বিষয়ে সদ্য বিবাহিত যুবক যুবতী অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। উগ্র প্রকৃতির যুবক অনেক সময়ে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে প্রশ্ন করে বসে—তুমি কি পূর্বে আর কাকেও ভালবাসতে? এরকম প্রশ্ন শুনলে নূতন বধূর হতভম্ব হয়ে পড়ার খুবই সম্ভাবনা। সে হয়তো ভীতগ্রস্ত হ'য়ে আমতা-আমতা করে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলে ফেলে এবং নববিবাহিত স্বামী সেগুলিকে ধ্রুবসত্য বলে ধরে নেয়। অনেক সময়ে এই রকম বাদানুবাদের পরে বধূর ব্যবহারে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সে তখন স্বামীকে এবং স্বামীর গৃহের পরিজনদের শত্রু মনে করে। সে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে, চীৎকার করে, অসংলগ্ন কথা বলে অথবা শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। তখন আত্মীয় স্বজন ডাক্তার ডাকে, হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা চলে; মাথায় জল ঢালা হয় এবং ব্রমোভ্যা লরিয়ান অথবা ঘুমের ওষুধ সেবন করতে দেওয়া হয়। এ চিকিৎসায় অল্পবিস্তর ঘুম হতে পারে কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর অবস্থা সেই একই রকম —আলুথালু বেশ, অসংলগ্ন কথাবার্তা, অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহার! এতো সেই সুপরিচিত হিষ্টিরিয়া নয় এ হল পুরোমাত্রায় পাগলামি যাকে আজকাল বলে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ। যারা অতি আদরে পালিত এবং অন্যের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগে বঞ্চিত সেই সব ছেলে-মেয়েদের পক্ষে বিবাহ একটা কঠিন পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষার সম্মুখীন হ'য়ে তারা এমনই দিশাহারা হ'য়ে পড়ে যে তখন পাগলামি আর চাপা থাকে না। পুরুষ ও নারী উভয়েই এইভাবে আক্রান্ত হতে পারে, তবে সাধারণতঃ বিয়ের সময়ে মেয়েরাই বেশীরভাগ ভেঙ্গে পড়ে। এরকম অবস্থায় কন্যাপক্ষ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন এবং কন্যাকে পিতৃগৃহে এনে মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হ'ন। এক্ষেত্রে জানা উচিত যে উত্তেজনা পূর্ণ গৃহে রোগীকে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থায় বিশেষ ফল হয় না —কিন্তু জানাজানির ভয়ে কন্যাপক্ষ রোগীকে স্থানান্তরিত করতে দ্বিধাবোধ করেন। মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সুরু করার পূর্ব্বে বা পরে অনেক সময়ে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের মনোনীত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং নিজেদের চিকিৎসকের দ্বারা রোগীর চিকিৎসার জন্য চাপ দিতে থাকেন। দুই পক্ষের এই মতানৈক্যের জন্য চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটে। চিকিৎসায় রোগিণীর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বরপক্ষ কন্যাপক্ষের চিকিৎসকের চিকিৎসা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন। বরপক্ষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে কন্যার বিবাহের পূর্ব

থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল এ ব্যাপারটি চেপে গিয়ে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। কিছুটা চিকিৎসার পর রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পূর্বেই বধূকে শ্বশুরালয়ে আনা হয়। সে অবস্থায় তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা, বক্রোক্তি এবং দুর্ব্যবহার করার ফলে রোগের পুনরাক্রমণ হ'য়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। এই সকল কারণে প্রয়োজন আরোগ্যলাভের পর রোগীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার এবং স্বামীকে ও তার আত্মীয় স্বজনকে রোগিণীর প্রতি ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সর্বপ্রকার অবিশ্বাস এবং সন্দেহের নিরসন না হলে চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয় না। চিকিৎসকদের মধ্যে মতানৈক্যের ও বিরোধের সৃষ্টি হ'লে অযথা সময় নষ্ট হয় এবং ফলে রোগীর প্রতি হয় ঘোরতর অবিচার। বিবাহের পর যখন রোগীর সুচিকিৎসার আশু প্রয়োজন তখন রোগীর সাতপুরুষে কেউ পাগল ছিল কিনা এ গবেষণার ফলে কেউই লাভবান হন না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে কোনো অজুহাতে বিবাহ ভেঙে দিয়ে ছেলেকে তাঁর অভিভাবকরা পুনর্বিবাহের সুযোগ করে দেন।

আজকাল প্রায়ই ছেলেমেয়েরা অভিভাবকের অমতে বিবাহ করে এবং যদি তারা সুখী হয় অভিভাবকদের সেক্ষেত্রে বাধা না দেওয়াই কর্তব্য। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে চিনতে পারে না এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মোহ কেটে যায়। কেউ বা অন্যের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা সত্ত্বেও তার রোগ মুক্তির জন্য বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। তারা জানে না যে বিবাহ উন্মাদ রোগের প্রতিষেধক নয়। যারা নিঃসঙ্গ; একাকী; তারা সমাজের আইন ও সংসারের বাঁধন মানতে অনভ্যস্ত। তাদের খাপছাড়া জীবন অন্যের নিকট পীড়াদায়ক। তারা কারো জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর এ প্রকার অস্বাভাবিক ব্যবহার বিবাহ বন্ধনকে প্রতিনিয়ত শিথিল করে দেয়। সন্তানের পিতামাতা হওয়া সত্ত্বেও তা'রা নিজেদের জীবনযাত্রার গতি পরিবর্তন করতে পারে না। এ রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে সন্তান সন্ততির জীবন দুর্বিষহ হয় এবং তাদের মধ্যেও অচিরে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়।

জীবনে সকল সময়েই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়—বাঁচতে গেলে জীবনের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা দরকার নইলে হয় জীবনের পরিসমাপ্তি। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে—কিছুতেই মনের সমতা রক্ষা করতে পারে না। নারীদের এইরূপ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয় সন্তান প্রসবের সময়ে। বিবাহের সময় যাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে সন্তান প্রসবের পূর্বে বা পরে তাদের ক্ষেত্রে ঐ প্রকার মনোবৈকল্যের সম্ভাবনার কথা মনে রাখা প্রয়োজন; এই সময় মানসিক ব্যাধি দেখা দেওয়া মাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে রোগ সত্বর নিরাময় হয়। মনোরোগীর আত্মীয়েরা প্রশ্ন করেন—সন্তানের মস্তিষ্ক বিকৃতির সম্ভাবনা আছে কিনা—কিন্তু এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তবে একথা সত্য যারা নিজেদেরই সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে না তাদের উপর সন্তান পালনের দায়িত্ব অর্পিত হলে সন্তানের দুর্গতির সীমা থাকে না। এক্ষেত্রেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়—গৃহের পরিবেশের প্রভাবের উপরই সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সন্তানের পাগল হওয়ার সম্ভাবনার অনুমানে গর্ভপাতের পক্ষে অভিমত দেওয়া কোনো প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নয়।

স্কিজোফ্রেনিয়া বা অন্যান্য দুরূহ মানসিক রোগাক্রান্ত রোগীদের অভিভাবকেরা মনে করেন রোগীর বিবাহ দিলেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'য়ে যাবে। কিন্তু এতে রোগীর তো বিশেষ উপকার হয়ই না উপরন্তু এই প্রকার রোগীর কবলে পড়ায় আরেকজনের প্রাণান্ত হয়। যারা স্কিজোফ্রেনিয়া অথবা বিষাদরোগে ভোগে তাদের কামনা-বাসনা স্তিমিত হ'য়ে যায় এবং অনেক সময়েই যৌন সংস্পর্শে তাদের আদৌ স্পৃহা থাকে না। এ অবস্থায় একজন সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর সঙ্গে নির্বাসনের ব্যবস্থার কোনো যুক্তি নেই। অথচ যে রোগী চিকিৎসান্তে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছে তা'র বিবাহের প্রস্তাবে চতুর্দ্দিক থেকে প্রবল বাধা তুলে সকল প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে যারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ তাদের কথাই জনসাধারণ মেনে নেয়।

আর দুয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেই এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বায়ু পরিবর্তন নিষ্প্রয়োজন—বরং এভাবে চিকিৎসকের নিকট থেকে রোগীকে সরালে সহসা রোগীর অবস্থার অবনতি হলে সময়োপযোগী ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না। স্বাস্থ্যনিবাসে বায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যাবশ্যক এবং এইভাবে রোগের পুনরাবির্ভাব রোধ করা সম্ভবপর। রোগীকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিনেমা দেখার ব্যবস্থায় উপকার তো হয়ই না উপরন্তু অপকারের সম্ভাবনাই বেশি। সিনেমা গৃহের ভীড়, ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা, নায়ক-নায়িকার চরিত্রের অভিব্যক্তি ও বিশ্লেষণ রোগীর মনকে অনেক সময়ে এমন আলোড়িত করে যে সিনেমা শেষ হওয়ার পূর্বেই রোগীকে পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। মনোরোগীর অভিভাবকেরা রোগীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য সচেষ্ট হন কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নিজেদের অবিবেচনা-প্রসূত ব্যবস্থার ফলে তাঁরা এই প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। রোগী যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে সে সময়ে তার প্রতি সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার করলে তার আচরণের দ্রুত উন্নতি হয়। অভিভাবকেরা অনেক সময়ে রোগীর আরোগ্যলাভের পরেও তার আচরণ অহেতুক সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের আচরণের বৈষম্যের জন্য এবং অনুপযোগী ও অন্যায় মন্তব্যের জন্য রোগীর আরোগ্যলাভ বিলম্বিত হয়।

শিশুর উচ্চতর স্নায়ু-প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য

লিওন আবগারোভিচ অরবেলি

আমি শারীরবৃত্তবিদ, তবু চিকিৎসকদের এই আলোচনায় যোগ দেবার সুযোগটুকু নিলাম তার কারণ, আমি মনে করি শিশু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে শারীরবৃত্তের মতো তত্ত্বগত (theoretical) বিজ্ঞানের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত।

কথাটা ঠিকই যে, আজকের দিনের তত্ত্বগত বিজ্ঞান যে ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তো দেখব, আমাদের বিচার-বিশ্লেষণে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করলে সঠিক তথ্যাবলীর মাধ্যমে আমরা এ বিজ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ ও বিশেষ করে মানুষের ক্রমবিকাশের গবেষণায় এই সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষের দেহ আর মন পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তার শারীরবৃত্ত বা পার্থিব সত্তাকে নিয়ে যেমন একতরফা আলোচনার অবতারণা হয়েছে ঠিক তেমনই হয়েছে তার মানস বা আত্মা সম্পর্কে। দেখা যায় সেখানে শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে, এই দুই সত্তা পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যাই হোক পরের যুগে আমরা দেখি শারীরবৃত্ত ও মনোবিজ্ঞানকে একই ধারায় বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। জড়জগতে মানুষের পরিবেশে মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় ধরনের উপাদানকেই সামগ্রিকভাবে বিচারের চেষ্টা আমরা এখানে দেখতে পাই।

এই কথাটি আমরা যদি মনে রাখি তো এটা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই বস্তু জগতের ও বিশেষ করে জীবজগতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান চালানো দরকার। আর মানুষ সম্পর্কে সম্যক জানা আরও দরকার। এখানে দেহ ও মন এই দুই সত্তাকে একই সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে কারণ আমরা দেখি মানুষ তথাকথিত জীবজগৎ থেকে তফাত হয়ে গেছে, সে তার নিজের প্রতিভূ, সে স্রষ্টা, সে সমাজবদ্ধ।

দেহের সঙ্গে মনের যে জটিল পরস্পর-নির্ভরশীল সম্পর্ক (correlation) রয়েছে তার ধরন ও বিকাশ যদি এই ক্রমবিকাশের (development) পথে বিচার করে না দেখা হয় তো সে সম্পর্কে সঠিক জানা যাবে কিভাবে? মানুষের ক্রমবিকাশের গবেষণায় ও মানবমনের ক্রমশঃ বিকাশকে জানার ব্যাপারে আমাদের দেশে যে সবসময়েই জোর দেওয়া হয়, সে শুধু এই কারণেই। সেচেনভ্, পাভলভ, বেকতেরেভ, এঁদের সহকর্মী ও অনুরাগীরা সকলেই আকৃষ্ট হয়েছেন এদিকে। অবশ্য এখনও একথা বলা চলে না যে, বিজ্ঞানের এই দিকটি পুরোপুরি পরিণত হয়ে উঠেছে। এ অংশকে উন্নত করে তুলতে আরও পরিশ্রম প্রয়োজন। মানবমনের ক্রমবিকাশ, মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের সঙ্গে তার শারীরবৃত্তগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে এখনও প্রচুর খাটতে হবে।

শিশু-চিকিৎসকরাও যে ক্রমশঃ এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন এজন্য আমি তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গেল কয়েক বছরে লক্ষ্য করেছি তাঁদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে এসেছেন। এই বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন গবেষণা তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। ইন্‌স্টিট্যুট অফ পেডায়েট্রিক মেডিসিন-এর অবদান এখানে বিশেষতঃ উল্লেখ না করে পারি না। এই সংস্থার ডিরেক্টর এন. তে. সুতোভা, অধ্যাপক এস. এস. মাসলভ ও বিশেষভাবে অধ্যাপক এ. এফ. তুর তাঁদের পরিচালিত ক্লিনিকগুলিতে আমাদের গবেষণা ইচ্ছামতো চালাতে দিয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

আমরা শিশুর উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার (Higher Nervous Activity) ক্রমবিকাশ (development) সম্পর্কে জানতে চাই—কি উদ্দেশ্যে ? প্রথমত আমরা ক্রমবিবর্তনের (evolution) ধারাটিকে ভালোভাবে বুঝতে চাই। দ্বিতীয়ত, আমরা বুঝতে চাই মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে কিভাবে গড়ে ওঠে।

পরিবেশের সঙ্গে স্নায়ুপ্রক্রিয়া মাধ্যমে শিশুর সাধারণ সম্পর্ক ও উচ্চতর স্নায়ু-প্রক্রিয়া মাধ্যমে তার বিশেষ ধরনের সম্পর্কের রূপ যদি যথাযথ না জানা যায়, তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায় না। উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়া বলতে আমরা কি বুঝি ? অধ্যাপক আই. পি. পাভলভের মতানুযায়ী উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়া বলতে স্নায়ু প্রক্রিয়ার একটি সামগ্রিক রূপকে আমরা বুঝি যা মানুষ বা কোন প্রাণীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইভান পেত্রোভিচ দেখান জীবের উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম কিছু পরাবর্ত ক্রিয়ার (reflex action) মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ; সেগুলি সে বংশানুক্রমিক ভাবে পায়। এই পরাবর্তগুলিকে বলা যায় মৌল পরাবর্ত সমষ্টি (basal fund of reflex acts)। স্নায়ু প্রক্রিয়া সম্পর্কে আই. এম. সেচেনভ বলেছেন যে, যে কোন স্নায়ু প্রক্রিয়ার রূপ বা প্রকাশ প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয়। অন্যভাবে বলা যায় বহির্জগতের প্রতিফলন জীবের ওপর ঘটে এই স্নায়ু প্রক্রিয়ারই মারফত। প্রাণী বড় হয়ে ওঠার আগে সে কেবল তার মৌল পরাবর্ত সমষ্টিকেই কাজে লাগাতে পারে। বাইরের পরিবেশ তখন তার ওপর ছাপ ফেলে এই পরাবর্তগুলোর মাধ্যমেই। প্রাণীর নিজ নিজ জীবনে মৌল পরাবর্তগুলির সঙ্গে সময়গত যোগাযোগ ঘটার ফলে, ক্রমে নতুন নতুন স্বতন্ত্র (individual) ধরনের পরাবর্ত গড়ে ওঠে। এই নূতন স্নায়ু প্রক্রিয়া প্রাণীর মৌল পরাবর্ত সমষ্টিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে পরিবর্ধিত করে তোলে।

উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে পর্যালোচনা করে দেখতে গেলে আমরা কতকগুলি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হই। বেশ মনে পড়ে আই. পি. পাভলভ আমাদের খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কারুর কারুর উচিত এই মৌল পরাবর্ত সমষ্টি নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণা চালানো। কারণ একে ভিত্তি করেই মানুষের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্নায়ু প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে।

এই মৌল পরাবর্ত সম্পর্কে সম্যক জানা যায় কি ভাবে ? পরিণত বয়সের প্রাণীতে এ পরাবর্ত সমষ্টিকে শুধু পরিণত অবস্থায় দেখা যায় তাই নয়, এগুলি পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও বিভিন্ন স্নায়ু প্রক্রিয়ার সঙ্গে জটিলভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সদ্যোজাত মানবশিশুকে কি কোন প্রাণীকে লক্ষ্য করলে জীবনের এই মুহূর্তটিতে তার বংশানুক্রমিক (hereditary) প্রক্রিয়াগুলি অবিকৃত অবস্থায় লক্ষ্য করা সম্ভব। এগুলি তখনও অর্জিত (acquired) স্নায়ু প্রক্রিয়া থেকে পৃথক থাকে।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কি প্রাণীর সহজাত স্নায়ু প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ ঘটে ? নবজাতকের মৌল পরাবর্ত সমষ্টি কি এই সময়ের মধ্যেই পরিণত অবস্থায় পৌঁছয় না তখনও অপরিণত থাকে ?

সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে প্রাণী দু' ধরনের হয় : (১) যারা পরিণত অবস্থায় জন্মায় আর (২) যারা অপরিণত অবস্থায় জন্মায়। যারা পরিণত অবস্থায় জন্মায়—এরা সেই ধরনের জীব যারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জটিল প্রক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ। জন্মের পরই এরা চার পায়ে উঠে দাঁড়ায়, স্তন থেকে দুধ চুষে খায়, শব্দ (sound) সংকেতে এরা সাড়া দেয়, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে এরা চলাফেরা করে, ইত্যাদি। যারা অপরিণত অবস্থায় জন্মায়—এ এক অসহায় অবস্থা, আপন পোষণের জন্যে অপরের সাহায্য দরকার। এদের স্নায়ু প্রক্রিয়ার ধরন তখনও পরিণত অবস্থায় পৌঁছয় না।

এখানে একথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সহজাত ভাবে গড়ে-ওঠা স্নায়ু প্রক্রিয়াকে জন্মমুহূর্ত থেকে নতুন গড়ে-ওঠা প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলা না হয়।

যে সব প্রাণী অপরিণত অবস্থায় জন্মায় মানুষ হল তাদেরই দলে। আপনারা জানেন, সদ্যোজাত মানবশিশুকে বড় করে তুলতে কত যত্ন লাগে। কত দীর্ঘ সময়—১৬-১৭ বছরে শিশু বড় হয়ে ওঠে। জন্মমুহূর্তে যে সহজাত

স্নায়ু প্রক্রিয়া অপরিণত থাকে এতদিনে তা' পরিণত অবস্থায় পৌঁছয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন পরিবেশে এসে পড়ে। এই পরিবেশের প্রভাবে কয়েক বছরের মধ্যে শিশু যা কিছু অভ্যাস গড়ে তোলে তা সবই নতুন। মৌল পরাবর্ত সমষ্টি সম্পর্কে গবেষণা চালানো অত্যন্ত শক্ত কাজ বৈকি! কারণ এই পরাবর্ত-গুলির পরিণতি ঘটতে থাকে এক জটিল পরিস্থিতিতে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের সঙ্গে শিশুর স্নায়ুমণ্ডলীর যোগাযোগ ঘটে ও ফলে নতুন নতুন স্নায়ু প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে থাকে।

এখানে আবার কতকগুলি প্রশ্ন ওঠে: কি ধরনের পরাবর্ত-সমষ্টি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, মাতৃগর্ভ থেকে বাইরের পরিবেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের প্রভাবে এই পরাবর্তগুলির কি ধরনের পরিণতি ঘটে? স্নায়ু-সংস্থার গ্রাহী অঙ্গ (receptors) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি (sense organs) পরিণত হয়েছে কিনা কি ভাবে নির্ধারণ করা যাবে? সেচেনভ ও পাভলভ এই অঙ্গগুলিকে বলেছেন "বিশ্লেষণী অঙ্গ" (analysers)। কারণ এই অঙ্গগুলি বাইরের পরিবেশকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে তার পরিমাণগত ও গুণগত মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। যদি দেখা যায় শিশুর ইন্দ্রিয়স্থানগুলি যথাযথ পরিণতি লাভ করেছে তাহলেও প্রশ্ন উঠতে পারে এই বয়সের মধ্যে শিশু কি এতটা তৈরি হয়ে উঠতে পারে যাতে সে বহির্বাস্তবের উদ্দীপকগুলিকে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয় স্থানগুলির মাধ্যমে যথাযথ সাড়া দিতে পারে? যদিও বা সাড়া দেয় তা কি ধরনের? আরও নানান প্রশ্ন এসে পড়ে, যেমন: জন্ম-মুহূর্তে সহজাত স্নায়ু প্রক্রিয়া যে অবস্থায় থাকে তা কি বরাবর একই রকম থেকে যায়, না বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার ধরন পরিবর্তিত হয়? দেখা যায় শিশুর স্নায়ুমণ্ডলের সহজাত পরাবর্তগুলি ১৪-১৫ বছর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে এক পরস্পর-নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন?

এ সম্পর্কে শারীরবৃত্তে ও বিশেষ করে তুলনাত্মক (comparative) শারীরবৃত্তের শাখাতে বহু গবেষণা চালানো হয়। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য পরাবর্ত গড়ে তুলে ও তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেখা হয় কি ভাবে তারা একসঙ্গে মিলে যায়, পরস্পর সহযোগিতা করে, আবার একে অপরকে নিস্তেজিত (inhibit) করে।

বস্তুতঃ যদি জীবনের আয়ত্তাধীন সবকটি পরাবর্ত এক সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে তবে সত্যিই এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, শক্তির অনর্থক অপচয় ঘটে।

আমরা জানি স্নায়ু প্রক্রিয়াতে সমাসীকরণ (integration) ও সমন্বীকরণের (coordination) ক্ষমতা রয়েছে যা প্রতিটি পরাবর্তকেই সীমিত করে দেয়। সংখ্যাতীত ভাবে কোন প্রাণীর ওপর শর্তাধীন পরাবর্ত (conditional reflex) প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও মনে রাখতে হবে এই সব নতুন পরাবর্তের সঙ্গে একযোগে সহজাত পরাবর্ত-গুলিকে কাজে লাগতে হয় যাতে পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীলতা (corelation) গড়ে ওঠে, পরস্পরের সমন্বয় (coordination) ঘটে। এর ফলেই শর্তাধীন পরাবর্ত কার্যকরী হয়, না হলে তার ফলাফল প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। এখন কথা হল যখন প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে না তখন তারা লোপ পাচ্ছে, না সাময়িকভাবে প্রচ্ছন্ন (temporary masking থাকছে? আমাদের সামনে এই যে নানান প্রশ্ন, এগুলির সঠিক মীমাংসা হওয়া দরকার তবেই আমরা বুঝতে পারব সহজাত প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মৌল পরাবর্তগুলির সঙ্গে শর্তাধীন পরাবর্তগুলি কি নিয়মে শৃঙ্খলিত হয়।

এখন আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরছি, যেমন: শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলার ক্ষমতা কখন দেখা দেয়—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে না তার থেকে আরও পরে? শর্তহীন পরাবর্তগুলির (unconditioned reflex) সঙ্গে এগুলি কি ধরনের পরস্পর একবিধ আচরণ (reciprocity) করে? পরবর্তীকালে আবার যে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে তার ওপর ঐ ব্যতিহারের (reciprocity) কি প্রভাব পড়ে না? শর্তহীন পরাবর্তে কোন পরিবর্তন ঘটলে তার সম্পর্কিত নতুন গড়ে-ওঠা শর্তাধীন পরাবর্তে কি কোন ছাপ ফেলে না?

আগের দিকের গবেষণাগুলিতে এই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মাত্র কিছু কিছু কাজ হয়েছে।

এবম্বিধ প্রশ্নে আমাদের দেশের যে সব বিজ্ঞানীর কঠোর অধ্যবসায় এই বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তাঁদের নাম এখানে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। আই. পি. পাভলভ, আই. এস. সেচেনভ ও ভি. এম. বেকতেরেভ নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে বিজ্ঞানের এই মূল্যবান দিকটি গড়ে তোলেন। এরপর এন. আই. ক্রাস্নাগোরস্কি, এ. জি. আইভানভ স্মলেনস্কি, এন. এম. শেলভানভ, এন. আই. কাসাতকিন এবং আরও অনেকে তাঁদের শ্রমসাধ্য গবেষণার মধ্যে অন্যান্য সহকর্মীদের টেনে আনতে সমর্থ হন ও পরিশেষে সকলের সমবেত চেষ্টায় কিছু কিছু প্রশ্নের আংশিক সমাধান হয়।

যাই হোক এখন আর আংশিক ভাবে কাজ করার সময় নয়। এখন প্রতিটি প্রশ্নকে আলাদাভাবে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গবেষণা করার সময় এসেছে। এখন সংগৃহীত সমস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে গবেষণার ধারাকে এমনভাবে চালিত করতে হবে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এক উদ্দেশ্যমুখী হয়। যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বা যেগুলি হতে চলেছে সবগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে যে, মূল প্রচেষ্টাটির লক্ষ্য স্থির থাকে। এই উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা হল মানুষের উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

এখানে আমরা আর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। আমরা দেখি মানুষ অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় জন্মায়। জন্ম মুহূর্তে তার মৌল পরাবর্ত-সমষ্টি থাকে অপরিণত যা ক্রমে পরিবেশের প্রভাবের মধ্যে পরিণতি লাভ করতে থাকে। তার অর্জিত স্নায়ু প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে মৌল পরাবর্তগুলি কিছু অনুকূল পরিস্থিতিতে আবার কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নানাধরনের নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু এইটাই সব নয়, মনে রাখতে হবে ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষ এক অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর (Second Signalling System) সৃষ্টি হয়েছে তার স্নায়ু প্রক্রিয়ায়।

এ প্রসঙ্গে কতকগুলি সুপরিচিত তথ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। আই. পি. পাভলভের মতে পরিবেশের যে কোন উদ্দীপকই (stimulus) মানুষ বা কোন জীবের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সমর্থ—সে সহজাতই হোক আর শর্তাধীনই হোক। শর্তাধীন প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক এমন এক উদ্দীপকের সংকেত (signal) হিসাবে কাজ করে যেটি কোন এক শর্তহীন সহজাত পরাবর্ত ঘটাতে সমর্থ। স্বভাবতই পরিবেশ থেকে এমন সংকেতধর্মী অসংখ্য উদ্দীপক জীবকে অহরহ প্রভাবিত করে। এই ধরনের উদ্দীপনার ফলে জীবের যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাতে আমরা দেখি সেই জীবের সহজাত ও অর্জিত উভয় ধরনের পরাবর্ত মিশে যায়। অতএব দেখা যায় প্রতিটি উদ্দীপকই কোন না কোন শর্তাধীন পরাবর্তের কারণ। পরবর্তীকালে পাভলভ এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার নাম দেন সাংকেতিক পরাবর্ত (signal reflex)

এ ছাড়া মানুষ বলা ও লেখার জন্যে ভাষা সৃষ্টি করেছে। বহুবিধ শব্দকে ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ চরিত্রে রূপ দিয়েছে। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাকে অনুধাবন করার জন্যে গড়ে তুলেছে শব্দ সংকেত (word signal)। এর ফলে প্রকৃতিগত (natural) উদ্দীপকের সাহায্যে সাধারণ ধরনের পরাবর্ত গড়ে ওঠা ছাড়াও মানুষের বেলায় শব্দ (word) শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তুলতে পারে এবং তোলেও। এ ধরনের পরাবর্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ ক্ষমতার অধিকারী কেবল মানুষই। যদিও গৃহপালিত প্রাণীদের ক্ষেত্রে মানুষের শব্দ উদ্দীপকে (word stimulation) এ ধরনের শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠতে দেখা যায় তবু সেগুলি খুবই অনুন্নত ধরনের হয়। এই সমস্ত প্রাণীরাও কিন্তু শব্দ উদ্দীপকে প্রথম প্রথম যথাযথ সাড়া দেয় না। পরে দেখা যায় প্রাণীর ক্ষেত্রে এই শব্দ উদ্দীপকগুলি প্রায় প্রকৃতি-গত উদ্দীপকের মতই কাজ করে, কোন বিশেষ তাৎপর্য প্রকাশ করে না। কিন্তু মানুষের বেলায় শব্দ নির্দিষ্ট অর্থবোধক ; পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে কেবলমাত্র অনুধাবন করতে শব্দ সাহায্য করে না, এক বিশেষ তাৎপর্য

আছে শব্দের। মানুষ শব্দ মাধ্যমে বাস্তবের সামান্যীকরণ (generalisation) ও বিয়োজন (abstraction) ঘটায়। পাভলভ সুস্পষ্টভাবে এ তত্ত্বটি তুলে ধরেন ও পরবর্তীকালে আমরা এর গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করি।

অবশ্য মানুষ আজ পর্যন্ত লুপ্ত ও প্রচলিত যত ভাষার সৃষ্টি করেছে তার সমস্ত শব্দ যদি একত্রে জড়ো করা হয় তো তবু দেখা যাবে এই প্রকৃতিতে যত বস্তু ও ঘটনার সমাবেশ ঘটে তার সমস্ত কিছু ঐ শব্দসম্ভার ব্যক্ত করতে পারে না। প্রকৃতির ওপর মানুষ সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করেছে, বাস্তব ঘটনা প্রভৃতিকে বিয়োজন, সামান্যীকরণ ও অভিজ্ঞতা মাধ্যমে নূতন রূপ দিয়েছে। গড়ে তুলেছে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সৃষ্টি করেছে কত কিছুর। কিন্তু তবু তার তুলনায় বিচার করে দেখলে দেখা যায় যত শব্দ সে গড়েছে তা কোনভাবেই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই বিভিন্ন ঘটনা বা বিভিন্ন চিন্তাকে নানাদিক থেকে ব্যক্ত করতে আমরা অনেক সময় একই শব্দের আশ্রয় নেই। এর দ্বারা মানুষের স্নায়ু প্রক্রিয়া অতিমাত্রায় প্রসারিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে জটিল হয়ে ওঠে।

যাই হোক, উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ মূলতঃ যে মৌলিক নিয়মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা হল নির্দিষ্ট ধরনের সময়গত যোগাযোগ আর সহজাত ও অর্জিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে পরস্পর-নির্ভরশীল সম্পর্ক স্থাপন। এ আমরা লক্ষ্য করেছি আর আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তুও তাই।

এইটিই আমাদের মূল কথা। আমাদের একপাশে রয়েছেন আমাদের শারীরবৃত্তবিদ বন্ধুরা আর অন্যপাশে রয়েছেন শিশুচিকিৎসক বন্ধুরা, আপনাদের উভয়কেই একথা স্মরণ করিয়ে এই পথে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাতে আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি। এক্ষেত্রে গবেষণার ধারাকে কোন একটি বিশেষ দিকে আটকে রাখা উচিত নয়। শুধুমাত্র মনুষ্যেতর প্রাণীর উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার গবেষণার মধ্যেই কাজ সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। পাভলভের যুগে অবশ্য গবেষণার ধরন এই রকমই ছিল। তখনকার কালে যথেষ্ট সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় এমন দুটো-একটা সরল ধরনের ক্রিয়াকলাপের ওপর সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গবেষণা চালানো হত উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার সূত্রগুলিকে জানবার জন্য। সে সময় এর প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখেছি পাভলভ তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে কত নিপুণ-ভাবে এ বিজ্ঞানের প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান করেন। লালাগ্রন্থির (salivary gland) ক্রিয়া-কলাপকে গুরুমস্তিষ্কের (cerebral cortex) প্রক্রিয়ার সূচক (index) হিসাবে ধরে নিয়ে পাভলভ সময়গত যোগাযোগের মূল সূত্রটিকে আবিষ্কার করেন ও বিশেষ করে শর্তাধীন পরাবর্তের তত্ত্ব গড়ে তোলেন। কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থার (central nervous system) বিশেষ অঙ্গগুলি, যেগুলি বিশেষ করে বহির্বাস্তবকে বিভিন্ন অংশে ভেঙে নিয়ে বিশ্লেষণ করে তার পরিমাণগত ও গুণগত মূল্য নির্ধারণ করে, সেই বিশ্লেষণী অংশগুলির সম্পর্কে তিনি ঐ পদ্ধতিতেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। এইভাবে গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিয়ম-শৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু লালাগ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ প্রথমত একটি অংশ সংক্রান্ত ব্যাপার, দ্বিতীয়ত সে ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সরল ধরনের। পাভলভ অবশ্য কেবলই জোর দিতেন পেশী সঞ্চালন অর্থাৎ চেষ্টিয় প্রক্রিয়ার (motor function) মাধ্যমে গুরুমস্তিষ্ক সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। তার কারণ আই. এম. সেচেনভ দেখান গুরুমস্তিষ্কের যাবতীয় প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত চেষ্টিয় ক্রিয়াকলাপ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু চেষ্টিয় প্রক্রিয়ার অত্যধিক জটিলতা ও বহুতর প্রকাশভঙ্গী গবেষণার সেই প্রথম যুগে পাভলভকে সে পথ গ্রহণ করতে নিবৃত্ত করে।

মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই পরের যুগে দেখা যায় চেষ্টিয় ক্রিয়ার (motor act) সহজাত ও অর্জিত পরাবর্তগুলি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন ঘটে। এ পর্যায় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থার বিভিন্ন স্তরে (level) অস্ত্রোপচার

মাধ্যমে বিযুক্তি ঘটিয়ে প্রাণীর গড়ে-ওঠা চেষ্টিয় ক্রিয়া-কলাপের ওপর তার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। নিম্ন মেরুমজ্জার ধাপগুলি (segment) অতিক্রম করে স্নায়ু প্রক্রিয়া যত উপর দিকে ওঠে তাতে "স্তরে স্তরে" তত জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মেরুমজ্জার স্ফীত অংশে অর্থাৎ লঘু মস্তিষ্কে (cerebellum), মধ্যমস্তিষ্কে (midbrain) ও শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে স্নায়ু প্রক্রিয়ার এই জটিলতা সম্পর্কে আমরা এইসব গবেষণা দ্বারা অনেক কিছু জানতে পারি।

ভ্রূণের স্নায়ু সংস্থার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্নায়ু প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ এক সুনির্দিষ্ট ধারা মেনে চলে। প্রথমদিকে প্রতিক্রিয়াগুলি আদিম ও সরল ধরনের থাকে। ক্রমে সেগুলি সুপরিচিত জটিল ও বহুতর রূপে উন্নীত হয়ে ভ্রূণের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণকে তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহালও করে। ভ্রূণের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করলে তার মধ্যে শুধু নানাধরনের স্নায়ু প্রক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না, স্নায়ু প্রক্রিয়ার উচ্চতর অংশকেও ক্রমশঃ সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়।

মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি জন্মমুহূর্তে তার অনেক স্নায়ু প্রক্রিয়া তখনও গড়ে ওঠে না বা জটিল হয়ে ওঠে না। ক্রমে বেশ কয়েক মাস ও বছরের মধ্যে সেগুলি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে ও পুরানো স্নায়ু প্রক্রিয়া-গুলির ওপর স্তরে স্তরে নতুন ধরনের স্নায়ু প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ আমরা সময়টিকে বলি সম্পর্কাধীন পুনর্নির্দেশ (reorientation) ও অনুকরণের (simulation) যুগ। কিন্তু এই পুনর্নির্দেশ ও অনুকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বর্তমানে আমাদের উচিত এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গবেষণা চালানো। স্নায়ুমণ্ডলীর পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে স্নায়ু প্রক্রিয়া এক বিশেষ চরিত্রে উন্নীত হয় যা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের জানতে হবে স্নায়ুমণ্ডলীতে কেমন ভাবে এই পুনর্বিন্যাস ঘটে। পরিণত বয়সের মানুষের কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের সহজ চেষ্টিয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানি, কিন্তু সমস্যা এগুলির ক্রমবিকাশকে ধাপে ধাপে পরীক্ষা করা যায় কি ভাবে ?

আমার প্রথম কথা হল আজকের দিনের গবেষণাকে কোন একটি ক্রিয়ার একক ভাবে বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা চলতে পারে না। শিশুর শারীরবৃত্ত ও তার উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণায় তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ওপর একই সঙ্গে নজর দিতে হবে। কারণ শিশুর স্নায়ু প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে, যেমন—কতকগুলি জন্মমুহূর্তেই কতকগুলি একমাস পর, আবার কতকগুলি বা বৎসরান্তে। যদি মাত্র একটি ক্রিয়াকে বেছে নেওয়া হয় তবে একদিক থেকে যেমন সে সম্পর্কে সঠিক জানা যায় অন্যদিক থেকে দেখলে দেখা যায় সেটা বেঠিক। অর্থাৎ যদি উদ্দেশ্য থাকে ইন্দ্রিয়স্থানের ঐ ক্রিয়াটির যথাযথ রূপ সম্পর্কে জানা তো সেটা সঠিক হয় বটে, তবে পরিণত অবস্থায় তার রূপ কি দাঁড়াবে তা জানা যায় না। যদি, কতকগুলি ক্রিয়া-কলাপকে এককভাবে ধাপে ধাপে বিচার করে দেখা হয় তবে শিশুর জন্মমুহূর্তে তার ইন্দ্রিয়স্থানগুলি কিরূপ প্রক্রিয়া ঘটায় তা যেমন জানা যায় তেমনি জানা যায় শিশু বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে সেগুলির প্রক্রিয়ায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে আমরা এমন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি যেগুলির ওপর নির্ভর করে বলা চলে যে ইন্দ্রিয়স্থানগুলির ধর্ম নিরূপণে প্রচলিত পদ্ধতির ঠিক বিপরীতটি গ্রহণ করা উচিত।

বিশেষ করে তুলনাত্মক শারীরবৃত্তে প্রতিফলন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানোর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যেমন ধরুন ব্যাঙের শ্রবণ শক্তি আছে কিনা এ নিয়ে প্রচুর তর্কের অবতারণা হতে পারে। ব্যাঙ শুনতে পায় না এই ধারণাটিই প্রচলিত কারণ, বিভিন্ন ধরনের শব্দ উদ্দীপক প্রয়োগে দেখা যায়, ব্যাঙ সাড়া দেয় না। কিন্তু একবার এক বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ উদ্দীপকের সাথে ব্যাঙের পায়ে বৈদ্যুতিক উদ্দীপক প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেন। সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক উদ্দীপক ব্যাঙের পায়ে প্রয়োগ করলে ব্যাঙ পা ঝাড়া (jerk) দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে

একই সময়ে শব্দ উদ্দীপক প্রয়োগ করে দেখা গেল ব্যাঙ পা ঝাড়া দিল না। অতএব দেখা যাচ্ছে শব্দ উদ্দীপক এই বিশেষ অবস্থায় ব্যাঙের মজ্জা-উদ্ভূত চেষ্টিয় প্রক্রিয়াকে নিস্তেজিত করে। এ. আই. ব্রনস্তেইন অনুরূপ আর একটি পরীক্ষা করেন। কতকগুলি শিশুকে নিপ্‌ল চুষতে দিয়ে সাথে সাথে তাদের ওপর শব্দ, আলো ইত্যাদি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন। দেখা যায় তারা চোষা বন্ধ করে। কিন্তু ঐ সব উদ্দীপক আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োগ করে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুর কি প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা বুঝব সেগুলি নিস্তেজনা বা উত্তেজনা সম্পর্কিত? এখানে বিভিন্ন লক্ষণ তো স্পষ্টই প্রতীয়মান।

এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিঃসন্দেহে শিশুর ইন্দ্রিয়স্থানগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করে।

আর একটি প্রশ্ন দেখা যাক। শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলার ক্ষমতা শিশুর ক্ষেত্রে কখন দেখা দেয়? আমরা মনে করি তা নির্ভর করে শর্তাধীন পরাবর্তটি কি ধরনের তার ওপর। তা ছাড়া শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠলেও তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পরিশেষে দেখা যায় শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠার সময় শর্তহীন পরাবর্তে পরিবর্তন ঘটতে পারে। যার ফলে আবার ঐ শর্তাধীন পরাবর্তও পরিবর্তিত হতে পারে। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে শর্তাধীন ও শর্তহীন উভয় পরাবর্তই উভয়কে প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের তথ্যগুলিতে দেখা যায় ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু প্রক্রিয়া শুধু জটিল হয়ে ওঠে তাই নয়, সহজাত পরাবর্ত সমষ্টির ও তার সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে যা শর্তাধীন পরাবর্তগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি শর্তাধীন পরাবর্ত শর্তহীন পরাবর্তটিকে পুরোপুরি চিত্রিত করে। কিন্তু আপনারা যদি ছোট ছোট শিশুর ওপর শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তুলতে যান তো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন ঐ পরাবর্তে যথাযথ শর্তহীন পরাবর্তটি সব সময় সঠিক চিত্রিত হয় না। ক্রমবিকাশের পথে শর্তহীন পরাবর্তে পরিবর্তন ঘটতে থাকার দরুন এরূপ হয়।

আবার এমনও হতে পারে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠার সময়ের মধ্যে যদি শর্তহীন পরাবর্ত অন্য কোন তাৎপর্য লাভ করে। মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর অর্থাৎ শব্দ (word) সংকেত প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করলে এই প্রক্রিয়ার যে কি বিরাট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে তা প্রথমেই চোখে পড়ে। শিশু কিংবা পরিণত মানুষের বিভিন্ন তন্ত্রে (system) শর্তাধীন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠা সম্পর্কে আমরা অনেক সময় হালকা মন্তব্য করি। কিন্তু পাভলভ এই বলে সতর্ক করেছেন : যখন মানুষ সম্পর্কে কাজ করবেন, এ কথা যেন ভুলে না যান যে নিজের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করবার ক্ষমতা রয়েছে মানুষের, সে তার আপন ক্রিয়ার কৈফিয়ত দিতে সমর্থ। একটা কুকুরের ওপর কি একটা কয়েক মাসের শিশুর ওপর শর্তাধীন পরাবর্ত গড়া আর ৭ বছরের শিশুর ওপর শর্তাধীন পরাবর্ত গড়া—অনেক তফাত। দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর গড়ে ওঠার ফলে শিশু তার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কখনও স্বেচ্ছায় বা কখনও প্রশ্নের উত্তরে সে নানা কথা বলে। বিষয়ীকে (subject) গবেষণাকালে তার মনোভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করার জন্যে একবার এক সহকর্মীকে আই. পি. পাভলভ তীব্র সমালোচনা করেন।

বাস্তবিক শিশুর ওপর শর্তাধীন পরাবর্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি অনেক সময় শিশুকে যা বলা হয় তার বিপরীত আচরণ করে (negativism)। শিশু প্রতিবাদ করে—আলো বদলানো হল কেন—ছিল লাল, সবুজ হল কেন? তারা যে শুধু নিজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সচেতন হয় তাই নয়, বাইরের পরিবেশে কি ঘটছে সেটাও লক্ষ্য করে। শব্দসংকেত মাধ্যমে সে-সম্পর্কে সচেতন হয়। তা ছাড়া একটি নির্দিষ্ট বয়স থেকে শিশুর উপদেশ অনুযায়ী অভিক্ষা

(instructional test) ক্ষমতা লাভ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। স্নায়ু প্রক্রিয়া জটিল হয়ে ওঠার সাথে সাথে সে হৃদয়ঙ্গম (realise) করতে শুরু করে। এ ক্ষমতা-বলেই মানুষ পরিণত বয়সে এক চরিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে। কোন বিশেষ নির্দেশ বা অনুরোধ মানুষের ক্ষেত্রে এটা সেটা প্রতিক্রিয়া ঘটায় শুধু তাই নয়। আমরা দেখি এক দেশের মানুষ যে নির্দেশ বা অনুরোধ করে তার উত্তরে অন্য আর এক দেশের মানুষ সেইমত কাজ করে। হয়তো তারা কেউ কাউকে কোনদিন দেখেই নি। নানা ধরনের জটিল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এ সংকেত যায়, পৌছতে কত না বিলম্ব ঘটে, আবার নির্দেশমত কাজ সম্পন্ন করতে এক সেকেণ্ড নয়, হয়তো কয়েক বছর লেগে যায়।

দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের এ বিরাট তাৎপর্য সঠিক ভাবে বোঝা যাবে তখনই যখন শিশুর ওপর এবং স্নায়ু প্রক্রিয়া ইত্যাদির গড়ে ওঠার ওপর শব্দ সংকেতের প্রভাবকে আমরা ভালোভাবে জানতে পারব।

এই জীবজগৎ যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় জীবন-পথে নানা কিছু পরখ করছে। দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের ক্রমবিকাশ যে শুধু স্নায়ু প্রক্রিয়াগুলির বিভিন্ন যোগা-যোগ ঘটাতে সাহায্য করে তাই নয়। মানুষ তার একক জীবন-প্রচেষ্টায়: একটি যুগের মানবজাতির ইতিহাসকে গেঁথে রাখতে পারে। এখানে আমরা একটি মূল প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাই—এই ভাবে এক যুগের মানুষের নানা অভিজ্ঞতা আর-এক যুগের মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই পথেই এক পুরুষ আর-এক পুরুষকে বংশানু-ক্রমিক ভাবে তার অভিজ্ঞতাকে দিয়ে যায়। বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে এই হল একটির উত্তর।

অতএব দেখা যায় আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ ও তাহার সামাজিক সম্পর্কের জটিলতাকে জানতে শারীরবৃত্তবিদ ও শিশুচিকিৎসক উভয় পক্ষের যুক্তপ্রচেষ্টা প্রয়োজন। গোড়াতে কেবল শব্দের (word) মাধ্যমে পরিণত মানুষের সঙ্গে শিশুর পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে যা মানুষকে সমগ্র-জীবজগৎ থেকে তফাত করে দেয়।

সুতরাং আমার ধারণা আমাদের দেশে সাধারণতঃ আমাদের ওপর যখন এই নবীন জনসাধারণের স্বাস্থ্যও গড়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে সেখানে এ কাজের গুরুত্ব অনেকখানি। শিশু বড় হয়ে যে সমাজজীবন যাপন করবে তার প্রস্তুতি হিসাবে উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও মন গড়ে তোলার যে দায়িত্ব তার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি তো আমাদেরই ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

সপ্তম সারা ইউনিয়ন শিশু-চিকিৎসক সম্মেলনে এল. এ. অরবেলির বক্তৃতা—২৭শে জুন ১৯৫৭, লেনিনগ্রাদ। জুর্নাল ভীস্‌ইয়েই নের্‌ভ্‌নই দীয়াচেল্‌নস্তি ৯ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা ১৯৫৯-এ "অসোবেন্নস্তি রাজভিতিয়া ভীস্‌ইয়েই নেরভ্‌নই দীয়াচেল্‌নস্তি রেবেন্‌কা"-এই শিরোনামায় প্রকাশিত। মূল রুষভাষা থেকে বাংলায় অরুণ চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত।

যক্ষ্মারোগীর মন

ডাঃ সন্তোষকুমার দাস, এম. বি., টি. ডি. ডি., (ক্যাল),
এফ্. সি. সি. পি., (ইউ. এস্. এ.)

বলে রাখা উচিত যে এ আলোচনায় মনের জটিল ক্রিয়াকলাপের কোন সন্ধান দেবার চেষ্টা করা হয় নি। রোগের ওপর মনের প্রভাব অনেকখানি ঃ চিকিৎসক হিসাবে আমরা আবার সেটা প্রতিনিয়তই দেখছি। তারই দুটো-একটা উদাহরণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি।

আপনারা সকলেই জানেন যে বহু জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধি এখন চিকিৎসার আয়ত্তে এসে গেছে। যক্ষ্মা রোগ এর মধ্যে একটি। যক্ষ্মার চিকিৎসা এখন এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যেখানে বলা যায় যে সঠিক সময়ে ঠিকমত চিকিৎসা করলে শতকরা নব্বুইয়েরও বেশী রোগীর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। কিছুদিন আগে শতকরা নব্বুইয়ের বেশী রোগী অবধারিত মৃত্যু বরণ করে নিত। যক্ষ্মা নামের সঙ্গে এমন আতঙ্ক জড়িত ছিল যে সেই আতঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করে এদের মনে আশার সঞ্চার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। আজকের পরিস্থিতি তেমন না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে যথাসাধ্য চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগী উপকার পায় না। আবার এমনও দেখা যায় যে বিনা-চিকিৎসায় বা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় সময় সময় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

একথা অনস্বীকার্য সে কিছু কিছু যক্ষ্মা জীবাণু প্রচলিত ওষুধের দ্বারা প্রভাবিত হয় না অথবা রোগীর দেহের জীবাণুগুলো প্রচলিত ওষুধের বিধিমত প্রয়োগের অভাবে ঔষধ-রোধক (drug resistant) হয়ে যায়। কিন্তু এর দ্বারা কি রোগ আক্রমণ ও নিরাময়ের সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করা চলে ?

যেখানে সম্পূর্ণ নিরাময়ের পর রোগী ঘরে ফিরে এসে দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করার পরও আবার রোগাক্রান্ত হয় সেখানেই বা আমাদের বক্তব্য কি ? এ কথা ভুললে চলে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অর্থাৎ এক কথায় হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামের নিশ্চিন্ত জীবনযাপন ব্যাহত হওয়ার দরুন পুনরাক্রমণ হতে পারে। কিন্তু যেক্ষেত্রে এর কোনটিই ঘটছে না অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটছে না, বা কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে পুনরাক্রমণের বিকল্প কারণ আমাদের খুঁজতেই হবে। রোগ নিরাময় ব্যাপারটা আরও জটিল। শুধু যক্ষ্মা নয়, সব রোগের কথাই আমি বলছি। ধুলো পড়া, মাদুলি, দৈবচিকিৎসা বা হাতুড়েদের অদ্ভুত বিপজ্জনক প্রক্রিয়ায় অনেক রোগীর অনিষ্ট ঘটলেও কিছু কিছু রোগীর যে উপকার হয় এ কথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি ? যদি বলা যায় এগুলি Nature Cure অর্থাৎ আপনা থেকে ভালো হচ্ছে, তা হলেও এই Nature Cureএর সঠিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তব্য। সে দায়িত্ব গবেষক ও পণ্ডিতদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি সাধারণ পাঠকদের জন্যে আমার নিজের ব্যক্তিগত দু-একটি অভিজ্ঞতা বিবৃত করছি।

একটি স্ত্রীলোক, বয়স ৩৪।৩৫, চারটি সন্তানের জননী। চিকিৎসা খুব ভালোভাবে চলল। রঞ্জন-রশ্মি চিত্রে অসুখ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে বোঝা গেল, থুতুতে জীবাণু অন্তর্হিত হল, রক্ত পরীক্ষার ফল স্বাভাবিক হল। কিন্তু রোগী সারে না। উঠতে বসতে কষ্ট হয়, চেহারা একেবারে কঙ্কালসার, মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না নানাভাবে পরীক্ষা করে। তখন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও সমাজ সেবিকার মারফত খবর নিলাম তাদের সাংসারিক অবস্থার এবং তার

স্বামীকে দেখা করতে বললাম। স্বামী বলল যে সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে স্ত্রীর আহার্য যোগাচ্ছে, অনেক কষ্ট করে ফল দুধ জোগাড় করা সত্ত্বেও স্ত্রী খায় না। স্ত্রীর মনে বদ্ধ ধারণা সে ভালো হবে না এবং সে দিনরাত মৃত্যু কামনাই করে। এও বুঝলাম যক্ষ্মারোগ যে সারে না স্বামীর মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল। আমি তাকে বোঝালাম তার ধারণা ভুল—তার স্ত্রী তো সেরে গেছেই, এখন মনের একটু স্ফূর্তি আনতে পারলে ও আবার কর্মক্ষম হয়ে তার সংসারের ভার নিতে পারবে। এর পর থেকে দেখেছি স্ত্রীলোকটির চেহারার খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে এবং যখনি সে এসেছে বেশ হাসিমুখেই এসেছে।

এখন আমি যদি বলি আমার সামান্য একটি আশার বাণীতে রোগিণী ও রোগিণীর স্বামীর মনে নিরাশার অন্ধকার কেটে গেল বলেই রোগিণী সম্পূর্ণ নিরাময় হতে পারল তা হলে কি খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে? আশা ও নিরাশা কিভাবে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, রোগজীবাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তার উত্তর আমরা পেতে চাই, শারীরবৃত্ত ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষকদের কাছ থেকে।

এখনও বহু লোকের মনে সেরে যাওয়া যক্ষ্মা সম্বন্ধে ভীতি আছে। অবশ্য সব সময় সেটা নিতান্ত অহেতুক নয়। হাসপাতালে একবার ভর্তি হলে অনেকেই ফিরে যেতে চান না। স্মরণ থাকতে পারে এই নিয়ে সরকারী একটি যক্ষ্মা হাসপাতালে ছোটখাট হাঙ্গামাও একবার ঘটেছিল। এর কারণ এই সব রোগী হাসপাতালে নিশ্চিন্ত পরিবেশে থাকে এবং ফিরে গিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইসব রোগীদের স্থানীয় হাসপাতালের বহির্বিভাগে নিয়মিত যেতে বলে ছুটি দেওয়া হয়। দেখা যায় যারা হাসপাতালের বাইরে এসে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তারা আর হাসপাতালে আসে না, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় তারা ভালো আছে। কিন্তু যারা কষ্টকর পরিবেশের চাপে পড়ে, তাদের প্রায়ই কোন না কোন উপসর্গ নিয়ে বছরের পর বছর আসতে হয়।

একটি মেয়ে, বয়স প্রায় বাইশ চব্বিশ হবে, দেখতে শুনতে ভালো এবং শিক্ষিতা। একটি ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ছেলেটি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। ছেলেটি সেরে ওঠে এবং নির্বিচারে মেলামেশার অধিকার পেয়ে ছাড়া পায় হাসপাতাল থেকে। শুধু তাই নয় বেশ ভালো একটি চাকরিও পায়। কিন্তু নিজে যক্ষ্মাক্রান্ত বলে মেয়েটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ঐ চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যায়। এরপর মেয়েটিকে ধরল যক্ষ্মায়। মেয়েটি প্রথমদিকে চিকিৎসা করাতে নারাজ ছিল, পরে নিজের সব সঞ্চয় নিঃশেষ করে একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়। মোটামুটি ভালো হলেও কিছু উপসর্গ থেকে যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একটি বিখ্যাত হাসপাতালে বহির্বিভাগে নিয়মিত দেখাতে থাকে। কিন্তু ফুসফুসের দাগ মিলিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি উপসর্গের দিক থেকে কিছুতেই পুরোপুরি সুস্থ হতে পারে না। একদিন তাকে বাড়ির অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি কেঁদে ফেলে। সে বলে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে ও দুটি মেয়েকে বাড়িতে পড়িয়ে তার সংসারে আর্থিক সাহায্য করত। কিন্তু সে বোকার মত নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখে নি। এখন মেয়ে পড়ানো বন্ধ, স্কুলের চাকরিও গেছে। তার ওপর বাড়ির সকলে তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। তার ধারণা তার জীবন বৃথা হয়ে গেছে। পরে সে করুণভাবে ব্যক্ত করল সেই ছেলেটির কথা। এতদিন ছেলেটির সঙ্গে সে পত্রালাপও করে নি। এর পরে এক অভাবনীয় যোগাযোগ ঘটে। ঐ ছেলেটি একবার চেকআপের জন্যে হাসপাতালে আসে ও উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। কয়েক মাস পর অপ্রত্যাশিতভাবে দেখি সেই মেয়েটির কি চমৎকার স্বাস্থ্য ফিরেছে, কত সুন্দর দেখতে হয়েছে! বললাম—বেশ ভালোই আছেন তবে আবার কেন এসেছেন? মেয়েটি সলজ্জভাবে অনুরোধ করে গোপনে একটি কথা শোনার জন্যে। সে বিয়ে করতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করে। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। এরা কলকাতায় এলে প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত এবং কয়েক বছর পর্যন্ত আমার সাথে তাদের যোগাযোগ

ছিল। তাদের চিকিৎসার আর কোন প্রয়োজন ঘটে নি।

এখানে আমরা দেখি সাংসারিক নিরাপত্তার অভাবে ও প্রেমে হতাশ হওয়ার জন্যে মেয়েটির মনে বিষাদ ও নিরাশা দেখা দিয়েছিল। তাই রোগমুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হয়ে নীড় বাঁধার স্বপ্ন যেই সে দেখে অমনি তার মনে বিশ্বাস, আশা ও ভবিষ্যতের সুন্দর সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুস্থ ও সদর্থক আবেগ মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে, এ বিষয়ে আমি এবং আমার মত চিকিৎসকদের কোন সন্দেহ নেই।

এ ছাড়া দেখা যায় (পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষজ্ঞদের পরিসংখ্যান থেকে) বড় বড় শহরে ও কলকারখানাময় শহরের উপকণ্ঠে যক্ষ্মার জীবাণু শতকরা প্রায় নব্বুই জনের শরীরে প্রবেশ লাভ করে। কোন কোন জায়গায় শতকরা আটানব্বুই জনের শরীরে এই জীবাণু প্রবেশের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মানে এই নয় যে শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশী লোকের এই রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বরং তার বিপরীত। অর্থাৎ খুব কম সংখ্যক লোকই রোগগ্রস্ত হয়। এর সঠিক কারণ কেউই বলতে পারেন নি। তবে এটা দেখা গিয়েছে অরাজকতা, রাষ্ট্রবিপ্লব বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখা দিলে রোগাক্রমণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মধ্যে এর প্রসার খুব দেখা গিয়েছে কিন্তু যে সব উদ্বাস্তু নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছেন তাদের মধ্যে এর প্রভাব বেশ কম।

কেবলমাত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দিয়ে এই ব্যাপকতার ব্যাখ্যা চলে না। নিরাপত্তার অভাব ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বহু সবল ও আপাতসচ্ছল জীবনধারণে সক্ষম যুবককেও রোগাক্রান্ত করতে পারে। নিজের ঘরবাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী ও বহুদিনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আসার দরুন যে দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, তার সঙ্গে রোগাক্রমণের কোন সম্বন্ধ আছে কি? সব দেশের পণ্ডিতেরাই এই বিষয়ে একমত যে শুধু ক্ষেত্র ও বীজ অর্থাৎ মানবদেহ ও রোগজীবাণু এই দুটিতে যোগাযোগ ঘটলেই রোগের উৎপত্তি ঘটবে, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মনে হয় এই রোগের—তথা যে-কোনও রোগের উৎপত্তি, বিস্তৃতি এবং আরোগ্যের সঙ্গে শুধু দৈহিক নয়, মানসিক অবস্থাও বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

সাধারণের মধ্যে এই রোগের আতঙ্ক এখন খুব কমে গিয়েছে। তারা জেনেছে এ রোগ আরোগ্য হয়। তাই আগেকার দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে।

অনেক সময় দেখা যায় একই পরিবেশে, একই সংসারের মধ্যে, একই খাদ্য গ্রহণ করে অনেকে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন কি দুজন রোগাক্রান্ত হচ্ছেন, বাদ বাকি সকলে সুস্থ থাকছেন। স্বামী যক্ষ্মায় ভুগছেন, স্ত্রী বছরখানেক ধরে একসঙ্গে রয়েছেন, সেবা-শুশ্রূষা করছেন, একই বিছানায় রাত্রিযাপন করছেন। অথচ সুস্থ আছেন। এরকম ঘটনা খুব বিরল নয়। এর জবাব আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞান দিতে পারেনি। সহন ক্ষমতা, প্রতিরোধ শক্তি প্রভৃতির জিগীর তোলা হয়েছে বটে কিন্তু সে কৈফিয়ত এতো দুর্বল যে কৈফিয়ত-রচনাকারীও সে বিষয়ে বেশী পীড়াপিড়ি করেন নি।

রোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও একই চিকিৎসায় ফল ভিন্ন রকমের হয়। আমরা বলি কোন ওষুধই পুরোপুরি ষোল আনা সফল হয় না। তবু জানতে ইচ্ছা করে কেন একই রকমের দুটি রোগীর একই চিকিৎসায় ভিন্ন ফল দেখা যায়? শুধু তাই নয়, একই রোগের একই চিকিৎসায় ভিন্ন চিকিৎসকের হাতে ভিন্ন ফল দেখা যায়, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ভুল হলেও। কিছু দিন আগে এক বেসরকারী হাসপাতালে দেখেছিলাম বহির্বিভাগে অনেকগুলি চিকিৎসকের মধ্যে একজনকেই বেশী লোক পছন্দ করছেন এবং ভিড় করছেন। এই ডাক্তারবাবুর চেহারাটা ছিল ব্যক্তিত্বহীন ভালো মানুষের মত। ব্যবহার ছিল খুব সহৃদয় আর তিনি কথাও বলতেন খুব বেশী। আবার কলকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে দেখেছি গম্ভীর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগী দেখেন, কথা বলেন খুব কম। শিক্ষিত ও

বুদ্ধিমান সমাজে এঁর প্রভাব অনতিক্রম্য। সেই সম্মানিত চিকিৎসক যখন আবার বিনা পয়সায় রোগী দেখতে শুরু করেন তখন লোকের মোহ অনেকটা কেটে যায়। ঠিক নিজের ডাক্তারটি না হলে অনেকেরই মনঃপূত হয় না, রোগ নিরাময়ও হয় কম। সব মানুষের যেমন চেহারা একরকম নয় সেই রকম মনের গড়নও বিভিন্ন। বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বশালী চিকিৎসকের দ্বারা তারা যে প্রভাবিত হবে এইটাই তো স্বাভাবিক! ফিটফাট না থাকলে ডাক্তারের পসার কমে যায়, কিন্তু রোগ সারাবার জন্যে ফিটফাট থাকতে হবে কেন? আবার অনেকে বলবেন ঐ ময়লা ছেঁড়া প্যান্ট-পরা পাগলাটে ধরনের ডাক্তার কিন্তু রোগের ধন্বন্তরী। অনেকের ধারণা নেই যে অননুমোদিত চিকিৎসকেরা যত সংখ্যক রোগী দেখেন, অনুমোদিত চিকিৎসকেরা তার শতাংশের একাংশও দেখেন কিনা সন্দেহ। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু সকলেই বলেন—মনের বিশ্বাস। কি কারণে, কে, কাকে কখন বিশ্বাস করে বসবে—তারও বিজ্ঞানানুগ ভিত্তি আছে আশা করি।

টি, বি,-কে বলা হ'ত ভাবুক, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক বা প্রতিভাবানের অসুখ। কথাটা হয়তো ঠিক নয়। যাঁরা বড় হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজখবর সবাই রাখত এবং তাঁদের অসুখের খবরটা ফলাও করে জানানো হত। কিন্তু অখ্যাতনামা যে সব লোক এই ব্যাধিতে ভুগেছে বা মরেছে তাদের খোঁজ কেউ রাখেনি। তবে একথা ঠিক, কবি বা শিল্পীরা স্বভাবতঃ স্পর্শকাতর। তাঁদের স্নায়ুতন্ত্র সব সময়েই উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে। বিচার-ক্ষমতা থেকে অনুভূতি-প্রবণতা এঁদের বেশী। এরজন্য এঁদের শরীরে কক্ ব্যাসিলাই-এর বাসা বাঁধবার বিশেষ সুবিধা ঘটে কিনা, সেটা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য।

অনেক সময় দেখা যায়, জীবাণুর আক্রমণ ঘটেছে, প্লুরিসি (ফুসফুসের ওপরের ঝিল্লির টি, বি, জনিত প্রদাহ) হয়ে সেরে গেছে, রঞ্জন রশ্মির ছবিতে তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অথচ রোগী এযাবৎ কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নেয় নি বা ওষুধ খাবার দরকার মনে করে নি। এ সব ক্ষেত্রে রোগ সারলো কি করে? আপনা থেকে সেরে যাওয়া অর্থাৎ spontaneous recoveryর কারণ আমরা সঠিকভাবে জানি কি? আগেই বলেছি হাতুড়ে চিকিৎসাতেও রোগ সারে। আগের দিনে বহু ঢক্কানিনাদ করে এক একটি ওষুধ বের হত। আবার কিছুদিন পরে ডাক্তারদের কাছ থেকে ওষুধের বিষক্রিয়ার অভিযোগ আসাতে প্রস্তুতকারকরা ওষুধ বাজার থেকে তুলে নিতেন। এইসব ওষুধেও কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু রোগী সেরে উঠত। এই ধরনের রোগ নিরাময়কে সকলে নিশ্চয়ই Faith Cure-এর পর্যায়ে ফেলবেন। কিন্তু এই Faith Cure-এর বিজ্ঞানটাই বা কি?

তখন যুদ্ধের বাজার। বাজারে টাকা দিয়েও চাল মেলে না। বোমার ভয়ে বহু লোক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামের বড় মুদি লুকিয়ে রাতে চাল পাঠায়—তবে চলে। এই মুদির ছেলের খুব অসুখ। বাঁচবার আশা নেই। মুদি খুব দুঃখ করে বললে—ঐটে তার বড় ছেলে। তার বড় আশা ছিল ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখায়। কিন্তু বিধাতা বিরূপ। ছেলের লেখাপড়া কিছুতেই হল না। ছেলেটিকে দেখলাম, দুটো ফুসফুসই ভীষণ ভাবে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। তখনও আধুনিক ওষুধগুলি আবিষ্কৃত হয় নি। বুঝলাম এ রোগ আয়ত্তের বাইরে, সারতে পারে না। এবং মনে হল চিকিৎসার ভার আমি গ্রহণ করতে পারব না। আমার পিতা অস্থির হয়ে পড়লেন, বললেন, যদি ওর চিকিৎসা না করি আর যদি ছেলেটির বাবা চাল পাঠানো বন্ধ করে তা হলে এতগুলি লোক না খেতে পেয়ে মরবে। সুতরাং বেশী চিন্তা না করে চিকিৎসা আরম্ভ করব স্থির করলাম, পরদিন সকালে ছেলেটির বাবা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—আমি মাকড়চণ্ডী মায়ের মাথায় ফুল চাপিয়ে এসেছি এবং আদেশ পেয়েছি আপনি দেখলেই সেরে যাবে। মাকড়চণ্ডীর ওপর দায়িত্ব চাপাতে পেরে আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে চিকিৎসা চালাতে লাগলাম। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে অধুনা-বিলুপ্ত এবং ধিক্কৃত স্বর্ণ-চিকিৎসা শুরু করলাম। ছেলেটিকে প্রতিবারই বোঝাতাম তার লজ্জা পাবার কিছু নেই। ক্লাসে সব ছেলেই কিছু পাশ করে না।

তাছাড়া সে যদি পড়াশুনা করতে থাকে তবে তার বাবার এতবড় কারবার সামলাবে কে? কাজেই পড়াশুনা না করার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। বরং যত শীঘ্র সে নিরাময় হয়ে তার বাবার ব্যবসায় সাহায্য করতে পারে, ততই ভালো। ব্যবসা মাধ্যমে অনেক ভালো কাজও করা যায়। আর দিন বদলাচ্ছে এখন ব্যবসায়ীকে হেয়জ্ঞান কেউ করবে না। এই ছেলেটি নিখুঁতভাবে সেরে গেছে। এখন সে গ্রামের মধ্যে সেরা স্বাস্থ্যবান ছেলেদের একজন এবং ভালো ব্যবসাও করছে।

আমার মনে হয় আমার ঐ সহজ দু-চারটি আশ্বাস বাক্য তার লেখাপড়ায় অসাফল্যের দরুন উদ্বেগ ও হীনমন্যতা দূর করতে পেরেছিল। তার মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা কমবার ফলে স্নায়ুমণ্ডলী রোগস্থানকে সদর্থক-ভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তার মনে জেগে ছিল রোগমুক্ত হবার অদম্য স্পৃহা। যাকে ইংরেজীতে বলে will to cure। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। স্বর্ণ-চিকিৎসায় নয়, মনোচিকিৎসায় এই রোগটি ভালো হয়েছিল—যদি এই কথা বলি তাহলে খুবই কি বেঠিক হবে?

এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব যে রোগাক্রমণ, বিস্তৃতি ও নিরাময়ের ব্যাপারে ক্ষেত্র ও বীজ ছাড়া আর একটি তৃতীয় শক্তি নিঃসন্দেহে কাজ করে। এই তৃতীয় শক্তির সঠিক পরিচয় অর্থাৎ মানব-মনের তথাকথিত রহস্য ও জটিলতার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে সক্ষম হবে না।

সম্পাদকের বক্তব্য

ডাঃ দাসের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের এক সময়কার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক সার উইলিয়ম অস্‌লারের মন্তব্য মনে পড়ল। টি-বি রোগীর বুকে কি ঘটেছে তার থেকে ঢের জরুরী তাদের মগজে বা মনে কি ঘটেছে; রোগীর ভাগ্য নির্ভর করছে তার মনের অবস্থার উপর,—বলতেন অস্‌লার। ক্ষয়রোগের সঙ্গে মনের ক্ষত, বিশেষ করে ব্যর্থ প্রেমের ক্ষত এক করে দেখতেন ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিক—একথা বললে খুব অত্যুক্তি হবে না। ক্ষয়-রোগের আর এক নামই ছিল—Consumption! ব্যর্থ প্রণয়ী অনেকটা যেন ইচ্ছা করেই মৃত্যুবরণ করছেন ক্ষয়রোগের তুষানলে—এমনি করেই বর্ণিত হত লভ-ট্রাজেডির শেষ পরিচ্ছেদ। কীট্‌সের বিখ্যাত লাইন—Half in love with easeful death—বোধ হয় এদের নিয়েই লেখা। ডাঃ জর্জ ডের রোজনামচা থেকেই কয়েকটি রোগীর ইতিহাস বিবৃত করেছেন আমেরিকার ডাঃ ফ্র্যাণ্ডার্স ডানবার। এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—রবার্টকে ভালবেসে নাকি নষ্ট জীবনীশক্তি ফিরে পান, যার ফলে ক্ষয়-রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠতে পেরেছিলেন। প্রণয়ীকে উদ্দেশ করে তাই লিখেছিলেন :—

"I yield the grave for thy sake and exchange
My near sweet view of heaven for earth
with thee!"

ডাঃ দাস ক্লিনিসিয়ান হিসাবে যে সব প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তার সবটার না হোক অনেকগুলির উত্তর আজ মনোবিজ্ঞান দিতে পারে। দু-একটা প্রশ্ন এখানে আলোচনা করছি।

পাভলভের উত্তরসূরীরা, বিশেষ করে বিকফ ও তাঁর সহকর্মীগণ উচ্চমস্তিষ্কের সঙ্গে আন্তরযন্ত্রের যোগাযোগ সম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানুষের উচ্চমস্তিষ্ক আন্তরযন্ত্রকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি আন্তরযন্ত্র থেকে আবার উদ্দীপনা গিয়ে মস্তিষ্ককেও উত্তেজিত করে। বিকফের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর মস্কো ফরেন ল্যাংগোয়েজ পাবলিশিং থেকে সম্প্রতি ইংরেজীতে একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে।

এইবার প্রক্ষোভের কথা। এ-নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন। প্রথম নাম করব ডারুইনের। অনেকদিন আগেই পশু ও মানবদেহে প্রক্ষোভ-ক্রিয়ার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। জেম্‌স-ল্যাং ও ক্যানন-শেরিংটনের

প্রক্ষোভের রীতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব আজ সুপরিচিত। এর পর বলা চলে বেখ্‌তেরেফের কথা (১৯২৮)। তার আগেই অবশ্য (১৯১৭) অসিপফ্‌ প্রমাণ করেন যে 'ইমোশন্‌'—শর্তাধীন পরাবর্ত-ক্রিয়ার ফল।

পাভলভপন্থীরা এ নিয়ে বিশেষ গবেষণা করে যে ধারণায় এসেছেন সেটা মোটামুটি এইরকম: বহির্জগৎ থেকেই হোক আর আন্তরযন্ত্র থেকেই হোক তীব্র উদ্দীপনা মস্তিষ্কে এলেই—উচ্চমস্তিষ্কের আলোড়ন ঘটে। এই আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে সাবকর্টেক্স বা নিম্নমস্তিষ্কস্থিত অক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রগুলোতে (Centres of the vegetative nervous system)। ফলে আন্তরযন্ত্র ও আন্তর-গ্রন্থিগুলোতে উত্তেজনার স্পন্দন বইতে থাকে। এই স্পন্দন আবার উচ্চমস্তিষ্কে পৌঁছে সাড়া জাগায়; এদের সক্রিয় অবস্থার কথা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। এইভাবে গোটা দেহে [আন্তরযন্ত্র, আন্তরগ্রন্থি ও পেশীগুলোতে] প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। এই হল প্রক্ষোভের শারীরবৃত্ত।

বিকফের মতে প্রক্ষোভ জীবদেহের এক অতি জটিল প্রতিক্রিয়া। শর্তহীন ও শর্তাধীন পরাবর্তের মিশ্রণ। আন্তরজগৎ ও বহির্জগৎ—দু-জায়গা থেকেই এ-সব পরাবর্তের উদ্ভব। প্রক্ষোভ মাত্রেরই জটিলতা ও তীব্রতা এত বেশী যে গোটা মস্তিষ্কই এরদ্বারা অভিভূত হয়। কাজেই দেহ-মনের সর্বত্র এর অভিব্যক্তি।

পাভলভ বলেছেন—প্রক্ষোভের দরুন মানসিক ও শারীরিক স্তরের পরিবর্তনগুলোকে আলাদা করে দেখা চলে না। "Who would separate"—he asks—"in the unconditioned, very complex reflexes (instincts), the physiological, the somatic, from the psychical i.e., from the experiences of the mighty emotions of hunger, sexual desire, rage etc...."

প্রক্ষোভের তীব্রতার ফলে উচ্চমস্তিষ্ক ও নিম্নমস্তিষ্কের সম্পর্ক-চ্যুতি ঘটতে পারে। নিম্নমস্তিষ্ক উচ্চমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পড়ার ফলে অনেক সময় মানুষ অস্বাভাবিক, বিসদৃশ, অযৌক্তিক ব্যবহার করতে পারে।

ডাঃ দাস্‌ সদর্থক ও নঙর্থক দুরকম প্রক্ষোভের কথা তুলেছেন। শারীরবিদ্যায় এক sthenic ও asthenic—এই নামে অভিহিত।

সদর্থক প্রক্ষোভ—আনন্দ, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি—উচ্চমস্তিষ্কের উদ্দীপনা জাগিয়ে, ক্রিয়াকলাপের গতিবেগ বাড়িয়ে তোলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সদর্থক প্রক্ষোভ হজমক্রিয়া বাড়ায়, স্নায়ুতন্ত্রকে উচ্চগ্রামে তুলে ধরে। এ ধরনের প্রক্ষোভাধীন প্রাণী, স্বাভাবিক অবস্থায় তার পক্ষে অসম্ভব—এমন অনেক আক্রমণ ও আত্মরক্ষা-মূলক কাজে সাফল্য দেখাতে পারে। নঙর্থক প্রক্ষোভ-ক্রিয়া এর বিপরীত। মস্তিষ্ক শক্তিকে ঝিমিয়ে আনে। স্নায়ুতন্ত্রকে স্তিমিত করে। প্রক্ষোভাধীন প্রাণীর কর্মক্ষমতা কমে যায়, তার বিপন্ন হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মনে রাখা দরকার, ভাষা ও চিন্তার মাধ্যম অর্থাৎ দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সাহায্য ছাড়া প্রক্ষোভের সম্যক অভিব্যক্তি সম্ভব নয়।

প্রক্ষোভ-কেন্দ্র কেবলমাত্র হাইপো-থ্যালামাসে অবস্থিত এ ধারণা প্রচলিত হলেও ভুল। রোগ আক্রমণে ও নিরাময়ে প্রক্ষোভের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য। এখন কথা উঠবে কক্‌ ব্যাসিলাস্‌ তথা যে-কোনো জীবাণুঘটিত রোগে প্রক্ষোভের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকতে পারে কিনা? অপ্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নেই। কেননা জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হলেই রোগ অনিবার্য, একথা কেউই বলবেন না। দেহ লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় আত্মরক্ষামূলক [যে কোনো বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে] সংগ্রামে দক্ষ হয়েছে। প্রক্ষোভাধীন দেহের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। এ সম্বন্ধে তথ্যাদি খুবই সীমাবদ্ধ হলেও, একেবারে নেই বলা চলে না। অ্যামব্রোশ ও নিউবোল্ড (১৯৫৮) হিপনটিজমের সাহায্যে আধুনিক-অমোঘ ওষুধে কাজ-না-হওয়া যক্ষ্মা-রোগীর অবস্থার উন্নতি করেছেন দাবি করেন। এ সম্বন্ধে রাশিয়ান ডাক্তার বত্‌কিন ও জ্যাকারিয়ান কিছু কাজ করেছেন। অধুনা মির্তোভস্কায়া প্রমুখ ডাক্তাররা এ নিয়ে কাজ করছেন।

সম্মোহনের সাহায্যে আন্তরগ্রন্থি ও আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন ঘটানো যায়। রক্তের প্রতিষেধক ক্ষমতাও বাড়ে কমে। জাপানী বিজ্ঞানী ইকেমী, culture medium-এ সম্মোহিত ব্যক্তির রক্ত মিশিয়ে, জীবাণু কলোনির আকার অনেকটা ছোট করা যায়, দেখিয়েছেন। প্লাটানভের মতে নঙর্থক প্রক্ষোভ টি-বি রোগীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে আর মনের চিকিৎসা [মনের চিকিৎসার মূল কথা হল রোগীর মনে সদর্থক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করা] দেহ ও জৈবক্রিয়াতে প্রভাবিত করে জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহের সংগ্রামকে জোরদার করে। তাঁর—"The word as a physiological and therapeutic agent" (১৯৫৯)-এর ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত রোগ-ইতিহাসটি পঠনীয়। প্লাটানভও অসলারের মত মনে করেন—টি-বি চিকিৎসায় শুধু ফুসফুসের অবস্থা জানলে হবে না। তাদের মনের অবস্থাও জানতে হবে। শুধু রোগকে নয়, রোগীকেও চিকিৎসা করতে হবে। গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে, রোগীর মনকে না বুঝলে বিশেষজ্ঞকে বিপদে পড়তে হবে।

মানুষ অবশ্যই প্রণালীবদ্ধ জীব (মোটা কথায় একটি যন্ত্র) এবং প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মত প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বর্তমানে যতদূর প্রসারিত তাতে দেখা যায় যে, মানুষের প্রণালীবদ্ধতা তার স্বনিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতার গুণে অনন্যসাধারণ। আমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী উচ্চতর স্নায়ু-প্রক্রিয়ার গবেষণার ভিতর দিয়ে যে ধারণাটা সবচেয়ে প্রধান, প্রবল ও স্থায়ী হয়ে ফুটে ওঠে তা হল : এই স্নায়ু-প্রক্রিয়া কী অসাধারণ পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে এবং কী বিপুল এর সম্ভাবনা ! কোনকিছুই অনড় নয়, কোনকিছুই অপরিবর্তনীয় নয় এবং যদি প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয় তবে সবকিছুই সবসময় সাধ্যায়ত্ত এবং উন্নতিসাধ্য।

একটি প্রণালীবদ্ধ জীব (যন্ত্র) আর কত আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা আর কৃতিত্বের অধিকারী মানুষ—এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা প্রথম দৃষ্টিতে কী প্রচণ্ড অসঙ্গতি বলেই না মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? চলতি মত অনুযায়ী একথা কি সাধারণভাবে স্বীকৃত নয় যে,—প্রকৃতির শীর্ষে বিরাজিত মানুষ, অসীম প্রকৃতির সম্পদসমূহের পরমধারক মানুষ, প্রকৃতির মহান নিয়মবিধি এবং প্রকৃতির যে নিয়মবিধি এখনও অনাবিষ্কৃত এই সব-কিছুরই মূর্ত প্রতীক মানুষ। এর উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত করা, তাকে চরম সন্তোষের অধিকারী করে তোলা। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ববোধযুক্ত স্বাধীন চিন্তার ধারণার প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় অংশই ইহাতে নিহিত থাকে।

—আই, পি, পাভলভ

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত

মহম্মদ আব্দুল করিম

কৈফিয়ত আগেই দিয়ে রাখি—'মানব-মন' আলোচনা করবে মানুষের মন নিয়ে, তার গড়ন, ক্রমবিকাশ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর তার ধারা আর কার্যকারণ নিয়ে। সেখানে ধান ভানতে শিবের গীত—ইতিহাসের প্রসঙ্গ কেন? প্রশ্নটা ওঠা খুব অস্বাভাবিক নয়। তাই গোড়াতেই সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রবন্ধ শুরু করলে প্রাসঙ্গিক হবে আর পাঠকের পক্ষেও আমার বক্তব্য বুঝতে সহজ হবে।

যে কোনো একটি ঘটনা, বিষয় বা অবস্থার বিকাশের ধারাবাহিক অনুসরণই হ'ল ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল মানব-সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির ধারা, অর্থাৎ মানুষের কাজ-কারবারের ইতিবৃত্ত। অবশ্য ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের কার্যকলাপ, কিন্তু 'ব্যক্তি'-কে উপেক্ষা করা যায় না। সমাজ ব্যক্তিকে নিয়ে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির কাজ-কর্ম আচার-ব্যবহার নিয়েই যেমন সমষ্টিগত-ভাবে সামাজিক আচারের অভিব্যক্তি হয় তেমনি, যে 'মন' সেই ব্যক্তির আচার-ব্যবহারকে পরিচালিত আর প্রভাবান্বিত করে সমাজের ইতিহাস রচনায়, সমাজের মনকে গ'ড়ে তোলার কাজে তার অবদান অনস্বীকার্য। ইতিহাসকে উপস্থিত করার ব্যাপারে ব্যক্তির মনোভাব আর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের উপকার করতে পারে, অপকারও করতে পারে। সমষ্টির ভাবধারাকে প্রভাবান্বিত করে তাকে সুস্থ সবল করতে পারে, আবার তাকে অসুস্থ কলুষিত করে অবাঞ্ছিত, ক্ষতিকর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে। সেই প্রসঙ্গের আলোচনাই হ'ল এই রচনার বিষয়বস্তু। মনে রাখা দরকার সামাজিক তথা ঐতিহাসিক পরিবেশ যেমন মানস-ক্রিয়া নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি আবার ব্যক্তিমনও সামাজিক ও ঐতিহাসিক গতিকে অনেকাংশে নিরূপিত করে।

ইতিহাস সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে তাঁরা সবাই জানেন যে, ইতিহাস বহু রকমের আছে—যথা সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইতিহাস মাত্র এক রকমেরই, ইতিহাস পৃথিবীতে মানুষের ক্রমবিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত। ইতিহাসের উপস্থাপনায় প্রকারভেদ শুধুমাত্র সমাজের অগ্রগতির বিশেষ বিশেষ দিকের উপর জোর দেওয়ার জন্য।

তেমনি আবার একদিকে যেমন বিশ্ব-ইতিহাস আছে, অন্যদিকে আছে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির খণ্ড খণ্ড ইতিহাস, বিভিন্ন যুগের ইতিহাস। এরও প্রধান যুক্তি হ'ল প্রথমতঃ প্রত্যেক খণ্ডের বিস্তারিত জ্ঞানলাভের সুবিধা আর দ্বিতীয়তঃ ঐ বিষয় জ্ঞানার্থীর পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হয়। কিন্তু মানুষের অগ্রগতি তেমন খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়নি, কালের গতিতে ধারাবাহিক ভাবে হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা সময়ে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হ'লেও আসলে কিন্তু কোনো দেশ কখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকেনি, পরস্পরের সংস্পর্শেই সভ্যতা আর সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

ইতিহাস তাই সামগ্রিক ভাবে একক বিশ্ব-ইতিহাস আর সেই ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতের পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ইতিহাস একটি বৈজ্ঞানিক বিদ্যা এবং আমাদের পুরো অতীতের পাকা দলিল। এই দলিলের একটা তাৎপর্য আছে। ইতিহাসের একটা উদ্দেশ্য আছে, আছে মূল্য। নিছক গল্পের খাতিরে ইতিহাস আনন্দ যোগাতে পারে, কিন্তু তা বিজ্ঞানের মর্যাদা পেতে পারে না। ইতিহাসের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হ'ল মানব-সভ্যতার বর্তমান স্তরের কার্যকারণ অনুসন্ধান করা—আমাদের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব যে অতীতের ঘটনাবলী থেকে হয়েছে আর

সেই অতীত ঘটনাবলী শুরু হয়েছে অজানা সেই সুদূর অতীতকাল থেকে—ইতিহাস তাই প্রতিপন্ন করে, অতীতের আলোকে বর্তমানকে ব্যাখ্যা করে।

কিন্তু তাই বা কেন? কী লাভ এত পরিশ্রম ক'রে? কী তার মূল্য। ইতিহাসের প্রাপ্য মূল্য আমরা দিই না, তার গুরুত্বও যে খুব বুঝি তাও জোর ক'রে বলতে পারি না। পাঠ্য হিসাবে অন্য বিষয়ের তুলনায় ইতিহাসকে আমরা লঘু ক'রে দেখি। কিন্তু সমাজ গঠন আর সভ্যতার বিকাশের অর্থে ইতিহাসের গুরুত্ব অনেক বেশী, অপরিসীম বললেও খুব অত্যুক্তি হবে না। প্রকৃত ইতিহাস-জ্ঞান কোনো দেশের বা জাতির নিজের সম্বন্ধে কূপমণ্ডুকতার দাওয়াই। প্রকৃত ইতিহাস জানা থাকলে অযথা হীনতার ভাব থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব, অন্য দিকে নিজেদের সম্বন্ধে অকারণে উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে দেখার অপরাধ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অতীতের ঘটনাবলী থেকে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যায়। ভাল যা কিছু গ্রহণীয় তা সমাজগঠনের কাজে ব্যবহার করা যায়, উন্নতও করা যায়। তেমনি আবার ভুল ত্রুটি বর্জন করে সমাজকে রক্ষা করা যায়। আন্তরিকতা থাকলে ঘটনার বা অবস্থার উৎপত্তির হেতু উপলব্ধি করে গলদ দূর করে সমাজের ও দেশের অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের পথ মুক্ত হয়। আমাদের এই ভারতবর্ষের ইতিহাসের তাৎপর্য এই দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে রচিত ইতিহাস যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে ফলাফলের বিচারে তার গুরুত্ব কম নয়। ভারতের ইতিহাস নানান সময়ে নানান উদ্দেশ্যে নানানভাবে রচিত হয়েছে। ভারতের ইতিহাস রচিত হয়েছে কখনও শাসকের স্বার্থে, কখনও বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনে। ইতিহাসের ঘটনাবলী সংকলিত ও প্রযোজিত হয়েছে রচয়িতার উদ্দেশ্য ও মনোভাবের পটভূমিতে।

এইখানেই প্রশ্ন ওঠে দৃষ্টিভঙ্গী আর পরিপ্রেক্ষিতের। সঠিক পরিপ্রেক্ষিত আর দৃষ্টিভঙ্গী যেমন বিশ্ব-ইতিহাস লেখার জন্য প্রয়োজন, তেমনি কোনো একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস লেখার জন্যও প্রয়োজন। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিক কিভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করছেন তা বহুল পরিমাণে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। কোন ঘটনার উপর কতখানি গুরুত্ব দিতে হবে, কোন ঘটনাকে কিভাবে উপস্থিত করতে হবে যাতে তার প্রকৃতি ঠিকভাবে বোঝা যায়, কোন ঘটনা গৌন আর কোনটা মৌলিক, কোনটা ক্ষণকালীন আনুষঙ্গিক আর কোনটা উদ্দেশ্যানুসারী, এ সবের যথার্থ বিচার একদিকে যেমন ইতিহাসের জ্ঞান ও সম্যক্ বোধের উপর নির্ভর করে, তেমনি অন্যদিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরও নির্ভর করে।

ইতিহাসে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেক রাজা-বাদশা, ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারক, সমাজসেবক, রাজনীতিক প্রভৃতির কথা আলোচনা করি, করতে বাধ্যও হই। কিন্তু সেখানেও আমরা সেই আলোচ্য-ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আর সমাজের উপর ক্রিয়াশীল তার কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য সব সময় নজরে রাখি না। তার ফলে ইতিহাসের সামাজিক রূপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়—ঘটনার ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ হয়। অতীতের ইতিহাস যদি বর্তমান আর ভবিষ্যতের মনোবৃত্তি আর মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করে তাহ'লে এই ত্রুটিগুলি অবশ্যই বর্জনীয়, নইলে প্রভাবের ফল খারাপ বই ভাল হবে না।

ইতিহাস যাঁরা লেখেন আর ইতিহাস যাঁরা পড়েন তাঁরা কেউই ইতিহাসের ঘটনাগুলির স্রষ্টা নন। ঘটনাগুলি অতীতে ঘ'টে গেছে এবং সেই ঘটনাগুলির জন্য বর্তমান বা ভবিষ্যতের কেউই দায়ী নয়। ঐতিহাসিকের কাজ হ'ল অতীতের গর্ভ থেকে ঘটনাগুলি বার ক'রে কালক্রম অনুসারে তা সাজানো আর ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র ধ'রে তার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা। ঐতিহাসিক মূল্যের ঘটনাগুলি বেছে নেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সব কাজে ব্যক্তিগত-চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া বাস্তবিকই কঠিন কাজ আর সেই জন্য পক্ষপাতহীন ইতিহাস রচনা এতই দুরূহ ব্যাপার যে তেমন

ইতিহাস-বিদও সত্যিই বিরল। কিন্তু ইতিহাসকে বিজ্ঞান-সম্মত করতে হলে পক্ষপাতহীন হওয়ার প্রয়াস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মন আর তার ক্রিয়ার প্রশ্ন তাই এখানেও রয়ে গেছে। এরও দুটো দিক আছে—এক, যিনি লিখছেন বা মাল-মসলা উপাদান সংগ্রহ করছেন তাঁর মন, আর দ্বিতীয়, যার সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে বা লেখা হচ্ছে তার মন; এই দ্বিতীয় মনেরও বিচার করতে হবে সেই কালের সামাজিক মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আর তৎ-কালীন পারিপার্শ্বিক প্রভাবের আলোকে। তবেই শুধু ঘটনার প্রকৃত বিশ্লেষণ আর ব্যক্তির কাজের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব।

মানুষের মনের বিকৃতি ঘটে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। ঘটনার ভ্রান্ত প্রভাবেও তা হয়ে থাকে, যেমন কোন আকস্মিক তীব্র মানসিক আঘাত পেলে হয়। এটা শুধুই ব্যক্তির মনের ক্ষেত্রেই সত্যি তাই নয়, সমষ্টির, সমাজের মনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে।

সমাজের, কোনো জাতির বা দেশের আর্থনীতিক কাঠামো তার আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা আর মানসিকতা গড়ে তোলে। একটি বিশেষ সমাজের মানসিকতা আর চরিত্রবৈশিষ্ট্য তার ঐ পরিবেশে গ'ড়ে ওঠে। ব্যক্তির মনের ব্যাধি যেমন পরিবেশের পরিবর্তনের দ্বারা দূর করা যায়, তেমনি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ক'রে সমাজকেও বিগড়ান বা শোধরান সম্ভব। যেমন ধরুন, মানুষে মানুষে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু হামেশাই যদি কানের কাছে কালো-ধ'লো, বামুন-শূদ্র আর হিন্দু-মুসলমানের তফাতের কথা শোনান হয় তা-হ'লে সেটা বিশ্বাস আর ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমষ্টি তাই এই প্রভেদের জিগির তুলে এই ধরনের মনোভাবকে জীইয়ে রাখে। ইতিহাসের ঘটনাবলী আর তার সংকলন ও প্রযোজনা পদ্ধতি একাজে তাদের সহায় হয়ে থাকে। অতীতের ইতিহাস এই ভাবে বর্তমানের মানসিকতা আর মনোভাব-সৃষ্টির বিশেষ পরিবেশ ও সৃজনী উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী আর পরিপ্রেক্ষিতের সঠিকতা খুবই জরুরী। ভবিষ্যতের ভারতকে ভালভাবে গ'ড়ে তুলতে হ'লে অতীতের ভারতকে বর্তমানের সামনে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করতে হবে। আজ ভারত সম্বন্ধে লিখিত ইতিহাসে এই পরিপ্রেক্ষিতের অভাব বড় বেশী, আর পাঠকদের মধ্যেও সেই কারণেই ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে গ্রহণ করার যোগ্যতারও অভাব রয়েছে। স্কুলে কলেজে ইতিহাস যাঁরা পড়ান সেই শিক্ষকরাও বহু কায়-ক্লেশে অর্জিত এই ত্রুটি বহন ক'রে দেশ বা জাতিপ্রেমিক-রূপে সগর্বে তাই ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। ভারতের ইতিহাসের পাঠ দেশের যত ক্ষতি করেছে বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বিশেষভাবে রচিত ইতিহাসের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। তার ফলে সে-দিনের ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েও নিস্তার পায় নাই, আজও তার খণ্ডিত দুই অংশ খেসারত দিয়ে চলেছে।

ভারতের ইতিহাসই সামনে রাখছি,কারণ বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে নিজেদের দেশের ঘটনাবলীই সব চেয়ে বেশী কার্যকরী। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের ইতিহাস এখনও অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ—গবেষণার আর প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের অনেক স্থান রয়েছে।

আদি ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মৌলিক তথ্য যা আছে তা সামান্যই। পরবর্তীকালের যা কিছু লিখিত হয়েছে তাও বিদেশী লোকের দ্বারা, বিদেশী ভাষায়, বিদেশ থেকে পাওয়া আর তার সঙ্গে স্বল্পপরিমাণ স্থানীয় মালমসলা। পাঠান-মোগল তথা মধ্যযুগের ঘটনাবলীই প্রথম বিস্তৃতভাবে লিখিত হয়। তার কিছুটা কালের গতিতে নষ্ট হয়েছে, কিছু প্রকাশ পায় নাই, আর কিছু যা হস্তগত হয়েছে তারও কিছু কিছু ইংরেজ আমল থেকেই বিভিন্ন দপ্তরে চাপা রয়েছে।

ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হ'লে

মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের জ্ঞানের খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, প্রয়োজনীয়তা আছে আর্যজাতির সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের—যার ফলে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আকস্মিকতার ভাব মুছে যাবে, কে ভারতীয় আর কে বিদেশী তার সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হবে।

আজ যদি আমরা আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীকে ঠিকভাবে নিরপেক্ষতার মনোভাব নিয়ে আর উত্তেজনা বা পূর্বধারণার বশবর্তী না হ'য়ে বুঝতে পারি তবেই আমরা সুযোগ্য জীবন যাপন করতে পারব, দেশের উপকারে লাগব। ইতিহাসই দেখাবে সেই পথ। ইতিহাসই বর্তমান-কালকে ব্যাখ্যা করে দেখাবে, তাকে বিশ্লেষণ করবে আর তার কার্যকারণ বলে দেবে।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু তাই ব'লে একান্ত বা মৌলিক নয়। ব্যক্তি যতক্ষণ মানব-জীবনের গতি আর প্রক্রিয়ায় তার অবদান সৃষ্টি করে, ততক্ষণই তার ভূমিকার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এই ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা ও ফলাফলও নির্ভর করে সময়ের উপযোগিতা, পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকতার উপর। ইতিহাসে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা শুধু মাত্র একটি সম-সাময়িক ব্যাপার নয়, ইতিহাসের পরিবেশ যুগান্তরব্যাপী। অতীত নিহিত রয়েছে বর্তমানের মধ্যে। বর্তমান অতীতকে নূতন রূপে প্রকাশ করে। সেই অতীতকে উপলব্ধি করাই হ'ল ইতিহাসের শিক্ষা। সেই জ্ঞান আর উপলব্ধির সাহায্যেই মানুষ অতীতের ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশের পরিবর্তন সাধন ক'রে নূতন শুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, সমাজকে কলঙ্ক আর কলুষ থেকে মুক্ত ক'রে সুস্থভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সামাজিক মন, জাতীয় মানসিকতাকে সুস্থ সবল প্রগতিপ্রসূ ক'রে তুলতে পারে।

কিন্তু কি সেই সামাজিক মন, কোথায় সেই জাতীয় মানসিকতা? সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতেই সামাজিক মনের প্রকাশ। জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই জাতীয় মানসিকতা প্রতিফলিত। তার সৃষ্টিতে, তার সংরক্ষণ বা বর্জনে, তার পরিবর্তন বা সংশোধনে ইতিহাসের রয়েছে বেশ গুরু-দায়িত্ব।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে কি ছাত্র কি শিক্ষক কেউই দেশের ইতিহাসকে ভারতের ইতিহাস বলে গ্রহণ করেন না। বিপুলসংখ্যক লোক একক ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু আমলের বা মুসলিম আমলের ইতিহাস ব'লে ভাগ করে দেখেন, গবেষণার্থীরাও বলতে গেলে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিষয় নির্বাচন করেন। এই ত্রুটি কখনই ঘুচবে না যদি ভারতবাসী নিজেকে ভারতবাসী হিসাবে না দেখে। দেশবাসী হিসাবে ভারতের মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ এবং একাত্মবোধ যদি না জন্মায় তবে আলাদা করে দেখার এই মনোবৃত্তি কখনই ঘুচবে না। এই মনোবৃত্তি জীইয়ে রেখেছে এযাবৎ রচিত ভারতের ইতিহাস। এই মনোবৃত্তির বিনাশ বহুলাংশে সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ইতিহাসের দ্বারা।

আজ ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে আমরা কত গর্বিত, ন্যায্যভাবেই গর্বিত। কিন্তু কে ব'লে দেবে যে, এই ঐতিহ্য এক দিনের নয়, এক যুগের নয়, এক কালের নয়; তা সৃষ্টি হয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে; অবদান তাতে কোন এক জাতির নয়, শতসহস্র বছর ধরে যুগে যুগে আগত বহু জাতির অবদান রয়েছে তাতে?

কিন্তু বর্তমানের প্রগতিশীল মুষ্টিমেয় ইতিহাস-বিদ্‌দের কথা বাদ দিলে আমরা ভারতের ইতিহাসের যে চিত্র পাই তা হ'ল একটি ধারাবাহিক বিকাশ নয়, আকস্মিক-ভাবে ঘটে যাওয়া টুকরো টুকরো ঘটনাচক্রের ফের মাত্র। ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে চট করে ইতিহাসের ছাত্রের চোখের সামনে যা ভেসে আসে তা হ'ল আর্যযুগের চিহ্নিত সভ্যতা আর সংস্কৃতির ঐতিহ্য মাত্র। আর ইতিহাসের উপস্থাপনার যে ভঙ্গী তাতে খামখাই মনে হবে সেইটেই যেন ভারতের আদি অকৃত্রিম শাশ্বত সভ্যতা—নির্ঝঞ্ঝাটে আপনা থেকেই যেন একদিনেই তা এই ভারতের মাটিতে গজিয়ে উঠেছিল, নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে আপন পথে বিকশিত হ'য়ে চলেছিল হাজার হাজার বছর ধ'রে। হঠাৎ বাদ সাধল ভারতের প্রথম বিদেশী আক্রমণ-

কারী তুর্কীরা এসে, আর তাদের প্রধান কাজ হ'ল ভারতের ধর্ম আচার সংস্কৃতি আর শুচিতাকে নস্যাৎ করা, ভেঙ্গে তছনছ করা। এই তুর্কীদের আগমনের ঘটনাকেও এমন ভাবে উপস্থিত করা হয় যে, ভারতের সঙ্গে তাদের পূর্বে যেন কোনো সম্বন্ধই ছিল না, তারা হঠাৎ কোনো এক প্রভাতে 'হিন্দু'র দেশ জয় করতে আক্রমণ ক'রে বসল। ইংরেজ বণিকরা যেমন কালক্রমে নানা সুযোগে নানা কৌশলে দখল জমিয়ে বসল, সেটা যেমন এই যুগের ইতিহাস পড়লে সহজেই বোধগম্য হয়, তুর্কী আগমনের ক্ষেত্রে তেমন স্বচ্ছ হয় না, ঘটনার জঞ্জাল সরিয়ে তা ইচ্ছাকৃত চেষ্টার দ্বারা জানতে হয়। আর ইংরেজরা ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রীষ্টান হ'লেও ঐতিহাসিকরা কেউই তাকে 'খ্রীষ্টান' আমল ব'লে অভিহিত করেন না, যদিও খ্রীষ্টান পাদ্রি সাহেবের কার্যকলাপ ভারতীয় সমাজ-জীবনে কম আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। তার একটি প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে, আমরা যে ইতিহাসের উপর নির্ভর করে চলেছি তা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদেরই মুখপাত্রদের রচিত ইতিহাস, মূলতঃ ভারতের দুটি বিরাট সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ-সূত্র পাকাপোক্ত ক'রে রাখার মতলবে লেখা। দৃষ্টিভঙ্গী আর পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট।

তারই ফল হয়েছে তথাকথিত 'মুসলিম' আমলের ইতিহাস এক গলদ আর ধর্মীয় গোঁড়ামীর ফিরিস্তি, গান্ধীজীর ভাষায় যাকে বলা যায় 'নর্দমা পরিদর্শকের বিবরণী'। আমাদের জাতীয় জীবনেও এর কুফল প্রকট-ভাবেই ফলেছে। একদিকে যেমন ইতিহাস লিখতে গিয়ে ধর্মের ভূমিকাকে অত্যুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার ফলে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বাদ দিয়েই নিছক সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 'হিরো' সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের চরিত্রগুলি সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে 'আদর্শপুরুষ' বা 'দুর্জন' হ'য়ে পড়ে। বাল্যকাল থেকে সেই ইতিহাসই প'ড়ে এক সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মনে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আর বিরাগ জমে ওঠে; অন্যদিকে অপর সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে হীনমন্যতাজনিত আক্রোশ আর আত্মপক্ষ সমর্থনের অসুস্থ আগ্রহ জাগে। কাজেই ঐ বয়স থেকেই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে ওঠে। একদা কৌশলে রোপন করা সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে পুরুষানুক্রমে যে মহীরুহে পরিণত হ'ল গত অর্ধশতাব্দী ধরে আমরা সেই বিষবৃক্ষেরই বিষে জর্জরিত। তা জেনেও কিন্তু আমরা ভারতের ইতিহাসকে রঞ্জিত করার অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।

এ তো গেল শেষের দিকের কথা! গোড়ার দিকেও আবার আর্যপূর্ব যুগকে আর্যতরযুগ বলে দেখাতেও সংকোচ হয় নি, আর আজ হরপ্পা আর মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার ক'রেও সেটাকে আলাদাভাবে দেখার ঝোঁক কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এই সব কারণেই ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিকতার চেতনা জাগ্রত হয়নি। মনে হয়, সুদূর অতীতের কথা স্মরণাতীত, এবং পরবর্তীকালের 'হিন্দু' আর 'মুসলিম' আমলের দুটি পৃথক ধারা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত বহু ইতিহাসবিদের কেতাব পড়লে তো মনে হবে ঐ দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া সংমিশ্রণের কোনো বালাই নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, অনেকে ইতিহাস লেখেন ঐটিই প্রতিপন্ন করতে। প্রশ্নমালা দেখলেও অনেক সময়ে দেখা যাবে শিক্ষক বা পরীক্ষক ইতিহাসের কোন বিষয়টা ভাল করে পড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, কাকে আদর্শপুরুষ আর কাকে দুর্জন বলে দেখাচ্ছেন, কার সুকীর্তি আর কার অপকীর্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

বহু 'ঐতিহাসিক' গল্প-নাটক, উপন্যাস বা চলচ্চিত্র আছে যেখানে ঐতিহাসিক সত্যের বদলে কল্পনা স্থান পেয়েছে বেশী—কোথাও উদ্দেশ্যমূলক কোথাও নিছক নাটকীয়তা সৃষ্টির অভিলাষ। বিষয়বস্তুর নির্বাচনও হয় অনেক ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলক। এসবের দ্বারা একদিকে জাতির হয় দুর্বিনাশ্য অনিষ্ট, অন্যদিকে ইতিহাসেরও ক্ষতি হয়, ইতিহাস হয় অবাস্তব, মিথ্যা। কাজেই এই ধরনের গল্প, নাটক, বই লেখা উচিত নয়, উচিত নয় এই ধরনের চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করা, আর তা হ'লে তার তীব্র সমালোচনা

হওয়া প্রয়োজন। বহির্বিশ্ব থেকে ভারতের বিচ্ছিন্নতার কাহিনী, অবিমিশ্র আর্য সভ্যতার কেচ্ছা এমনই একটি মিথ্যার দস্তাবেজ।

ভারতের প্রকৃত ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যে, ভারতে আর্যদের আগমন তেমন চট করে বা একতালে হ'য়ে যায় নি। কালক্রমে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসেছে, সংঘর্ষ হয়েছে তদানীন্তন ভারতের বাসিন্দাদের সঙ্গে, তারাও সভ্যই ছিল সেকালের মানদণ্ডে। বাসস্থাপনের জন্য আর্যদের সঙ্গে তাদের রক্তাক্ত সংগ্রামও হয়েছিল। ইতিহাস প'ড়ে ভারতবাসীকে এই সিদ্ধজ্ঞানকে স্বাভাবিক উপলব্ধিতে পরিণত করতে হবে যে তথাকথিত মুসলিম রাজা-বাদশারাই প্রথম 'বিচ্ছিন্ন' ভারতে প্রথম বিদেশী আক্রমণকারী নয়, এবং তারাও পূর্বের বিদেশাগত জাতিদের মত ক্রমে ভারতীয়তে পরিণত হয়। তাদের আর আরবদের ভারতে প্রবেশ আকস্মিকও নয়, শুধুমাত্র ইসলাম-উত্তর যুগেও নয়। ভারতবাসীকে এই শিক্ষা ইতিহাসই দেয় যে, একদা বিদেশীরা বর্বর ছিল বলেই ভারত আক্রমণ করে নি, ক্রমবিকাশমান বিশ্বসভ্যতার কিছু অংশ তাদের ভাগেও জুটেছিল। ভারতের সভ্যতায় তাদেরও অবদান রয়েছে, ভারতে এসেই শুধু তারা সভ্য হ'য়ে ওঠেনি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে বীর আছে, আদর্শ-পুরুষ আছে, বর্বর লম্পটও আছে। ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতিই শুধু নয়, ভারতের ধর্মদর্শনেরও ক্রমবিকাশ হয়েছে। ক্রমবিকাশ হয়েছে শত সহস্র বছর ধরে বহু জাতির, বহু সভ্যতা-সংস্কৃতির, বহু ধর্মচিন্তা আর আচারের ঘাত-প্রতিঘাতে, সংমিশ্রণে।

ইতিহাস লিখতে আর ইতিহাস পড়াতে চাই সত্যনিষ্ঠা, চাই বিজ্ঞানের যোগ্য নিরপেক্ষতা, ঐতিহাসিক বিচক্ষণতা আর ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিত, দৃষ্টিভঙ্গী আর সততা। যে যুগেরই ইতিহাস হোক না কেন, যে-রাজারই রাজত্বকালের ঘটনা হোক না কেন, তাকে বাস্তবভিত্তিক হ'তে হবে, যুগের সঙ্গে মানবতা বোধ নিয়ে পরিচয় থাকতে হবে, পরিচয় থাকতে হবে সেই যুগের আর্থনীতিক, সামাজিক আর রাজনীতিক পরিস্থিতির সঙ্গে. তবেই সম্ভব ইতিহাসকে সঠিকভাবে উপস্থিত করা। আমাদের ইতিহাসের বই পড়লে মনে হবে, ভারত মানে যেন শুধু উত্তর-ভারত, দক্ষিণ-ভারতের কথা যেন 'পরিশিষ্ট' বিষয় মাত্র।

এই জাতীয় ইতিহাস-জ্ঞান তাই অনিবার্যভাবেই এক জাতি বা সম্প্রদায়কে হেয় বা দুষ্ট মনে করতে এবং অন্যকে গুণসম্পন্ন ভাবতে শেখায়। তাই ইতিহাসের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হ'ল ইতিহাস-যোগ্য ঘটনাবলীকে সংকলিত ক'রে ধারাবাহিকভাবে সংবলিত করা, বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করে তাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করা। মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধ জাগরণই হ'ল ইতিহাস-বিদের পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্য।

ভারতে আর্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ

ডঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি

আর্য জাতিরা একটি জাতি হিসাবে ভারতের সমতল ভূমিতে বৈদিক যুগের প্রথম হইতেই ছিলেন বলিয়া আমাদের যে বিশ্বাস আছে, সে বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। নানা দলে বিভক্ত হইয়া আর্যরা ভারতের সমতলভূমিতে আসেন এবং সমতলভূমিবাসী অনার্যদের কৃষিজাত সম্পদে ও অন্যান্য ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হইয়া সমতলভূমি অধিকার করিতে চেষ্টিত হন। এককালে ভারতের সমতল অংশের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকৃত হয় নাই। নানা দল আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অথবা দৈবক্রমে এককালীন আক্রমণে অনার্যদের বিধ্বস্ত করিয়া নিজেদের আধিপত্য অর্জন করেন। এইরূপ বহুদল বিভিন্নকালে আসিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়া কিয়দংশ অধিকার করিয়াছেন এবং পরে প্রতি আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহারা বুঝিলেন বিভিন্ন দলের মিলন ব্যতীত দেশ জয় এবং সেই জয়কে স্থায়ী করা সম্ভবপর নহে। এই মিলনের মধ্যে আর্যজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে বৈদিক যুগের অনেক-কাল পরেই তথাকথিত ভারতীয় আর্যজাতি গঠিত হইয়াছে এবং অনেকদিন ধরিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আর্যসভ্যতার বুনিয়াদ গঠিত হইয়াছে।

এ দেশ জয় করার পূর্বে আর্যজাতি নিজেদের এক ধরনের অভ্যাসে, চিন্তায় ও ভাবনায় ব্যাপৃত রাখিতেন। তখন ব্যক্তির সত্তা প্রচ্ছন্ন ছিল, দলই ছিল সব। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবেই তাঁরা ভাবিতেন ও কার্য করিতেন তাঁদের চাষ করিতে হইত না। শিকার ও পশুপালন—এই দুইটিই ছিল মুখ্য জীবিকার্জনবৃত্তি। যাহা পাইতেন তাহা নিজেদের মধ্যে যথাযোগ্য কাজ করিয়া একসঙ্গে আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিতেন। বোধহয় সেকালে খাদ্য পরিবেশনের ভার অর্পিত হইত নারী সমাজের উপর। বছর তিরিশ পূর্বে পাঞ্জাবের সুদূর পল্লীতে অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে এই ধরনের উৎসব যে ছিল, তাহা আমি নিজেই দেখিয়াছি।

সেকালে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে তখন শিকার পাওয়া দুর্লভ। নিজেদেরও হাতে এমন কিছু নাই যাহা দিয়া এই দুর্যোগের প্রতিকার করা যায়। তখন একটি বড় শক্তির কথাই মনে পড়ে এবং তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষাই একমাত্র পথ বলিয়া মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই মেঘের, বজ্রের ও প্রকৃতির দেবতাই ইন্দ্র। সেইজন্য মনে হয় আর্যদলের প্রধান দেবতাই ইন্দ্র। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই মদ্যের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রাচীনকালেও আর্যদলে পানীয় মাদক দ্রব্যের প্রীতি ছিল এখনকারই মতো বোধহয় প্রয়োজনের অনুরোধে। সেকালেও শরীরের পুষ্টিকর মাদকদ্রব্য বোধহয় পাওয়া যাইত সোমরসে। এইজন্য ঋগ্বেদের একটি মণ্ডলই সোম-রসের মহিমা কীর্তনে নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সোম ব্যতীত আর্যরা কোনও কঠিন কার্য করিতে সাহসী হইতেন না। এই জন্যই তাঁহারা সোমকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পার্বত্য আর্যদের প্রধান দলের দুই দেবতা—ইন্দ্র ও সোম। তাঁহারা মনে করিতেন ইন্দ্রের অনুগ্রহেই দুর্যোগে তাঁহাদের নিজেদের কোন অনিষ্ট হইবে না বরং সুবিধাই হইবে। তাঁহাদের সেই দলবদ্ধ-ভাবে বাস করার যথাযথ বিবরণ আমরা কোন প্রামান্য গ্রন্থে পাই না। আকারে ইঙ্গিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

আর্যরা যখন দেশ জয় করিতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের মনে বিশ্বাস ছিল একমাত্র ইন্দ্রেরই অনুগ্রহে তাঁহারা দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারিবেন। এবং বিজিত

সমস্ত দেশই ইন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করিবে। ইহার ফলে ইন্দ্র তাঁহাদের প্রতি আরও অনেক বেশি অনুগ্রহ বর্ষণ করিবেন, যাহার ফলে তাঁহারা আরও অধিক দেশ জয় করিতে পারিবেন।

আর্যরা অতি সুরক্ষিত অনার্য-দেশ যখন আক্রমণ করিলেন, তখন জয়ের সম্ভাবনা অল্পই ছিল। কারণ অনার্যদের নগরনগরী ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত এবং তাহার পরে পারিখার দ্বারা আরও দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ছিল। এই সকল নগরীর রাজাদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য সংখ্যাও নিতান্ত নগন্য ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে সিন্ধু নদ এবং এইরূপ আরও কয়েকটি পাঞ্জাবের নদীতে এমন উৎকটভাবে প্লাবন দেখা দিল যে এই সব নগরীমধ্যস্থ ব্যক্তিরা প্লাবনের ফলেই প্রাণসঙ্কটে পড়িলেন।

সমতলবাসী অনার্যরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারায় দৈব দুর্বিপাকে প্রকৃতির হাতে এমনই মার খাইলেন যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত আর্য আক্রমণ-কারীদের হাত হইতে আত্মত্রাণের আর কোন উপায় রহিল না। ঋগ্বেদে দেখা যায় প্রাকৃতিক বিক্ষোভের ফলে অনার্যদের নিরানব্বইটি নগরী এইভাবেই বিপর্যস্ত হইয়াছিল। আর্যরা ভাবিলেন ইন্দ্র তাঁহাদের পূজায় খুশি হইয়া অনুগ্রহ করিয়াছেন। ঋষি গৃৎসমদ উদাত্ত কণ্ঠে ইন্দ্রের বীর্যমহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। এবং জগৎবাসীকে বুঝাইয়া দিলেন ইন্দ্রের শত্রুতা করিলে রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট। ইন্দ্রের এইরূপ শতশত কাহিনী ঋষির কণ্ঠে গীত হইতে লাগিল। ইন্দ্রের স্তবে আকাশ বাতাস মুখর হইল। অলৌকিক গুণাবলী ইন্দ্রে আরোপিত করা হইল। সেকালে এই সব স্তব মহিমায় তিল মাত্র অবিশ্বাস করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড অপরিহার্য ছিল। যাহা হউক, এই সমস্ত স্তব ও তৎসংশ্লিষ্ট আখ্যান হইতে ঋষিরা সাধারণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিতে চাহিয়াছিলেন যে দেবানু-গ্রহের চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নাই। এবং এই দেবানুগ্রহ লাভ করা আর্যদের প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই হইয়া থাকে। অন্য উপায়ে হয় না। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিতে ও অনার্যদের মনে নিজেদের সম্বন্ধে একটা মহান ধারণা সৃষ্টি করিতে যাহা দরকার সবই তাঁহারা করিয়া-ছিলেন। এ যুগে হইলে বলা হইত প্রোপাগাণ্ডা যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে ইন্দ্রের দয়াতেই আর্যরা দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আসল বিষয়টির কোন আলোচনাই হইল না। বরং মুখ্য ধারণাটি না বুঝিবার বা ধামা চাপা দিবার চেষ্টা—মানব মনের এই বিকৃতি প্রথম হইতেই দেখা দিল।

অনার্যরা এক একটি নগর নির্মাণ করিয়া নিজেদের প্রাচীরের আড়ালে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্যরা লাভের আশায় দেশ জয়ের নেশায় এবং হয়তো বা অভাবের তাড়নায় একসঙ্গে বহু লোকে মিলিত হইয়া এই আক্রমণ কার্য চালাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের শারীরিক শক্তি অধিক থাকাই সম্ভব। তাঁহারা ছিলেন অধিক উৎসাহশীল ও কর্মঠ। নানা সংগ্রাম করিয়া জীবিকা অর্জন করার ফলে তাঁহাদের মন দুঃসাহসিকতায় ভরপুর ছিল। কোথাও কোথাও তাঁহারা অনার্যদের অপরিচিত আগ্নেয়-অস্ত্র ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের বিহ্বল করিয়া দিয়াছিলেন। আর একদিকে সেই সময় সিন্ধু নদের এবং তাহার শাখা নদীগুলির বন্যা প্রায় নিয়মিত ঘটনা ছিল। এই জন্যই বোধ হয় নগরগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বন্যার তারতম্য পূর্বাহ্নে বুঝিবার মতো বৈজ্ঞানিক বিদ্যা তখন আর্য-অনার্য উভয়েরই যে অপরিজ্ঞাত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নগরের সমৃদ্ধ জীবনে অভ্যস্থ সুখী নাগরিকেরা প্রকৃতির অতর্কিত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়েই দুঃসাহসিক আক্রমণকারী আর্যরা বন্যার খরস্রোতকে অগ্রাহ্য করিয়া আক্রমণ করতঃ তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাক, ইন্দ্রের আরাধনার সহিত এই বন্যার সম্বন্ধ আছে কিনা। ইন্দ্রের আরাধনা আর্যরা বহু যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে সব সময় কী এই রকম বন্যা আসিত?

অনার্যেরাও তো ইন্দ্রের আরাধনা করিতে পারিতেন। দুই দলের মধ্যে যদি বিভেদ হয়, এবং দুই দলই জয়ের জন্য ইন্দ্রের আরাধনা করেন, তাহা হইলে কে ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিবে—এবং কেন? উপাচারের তারতম্য অনুসারে কী অনুগ্রহ বা নিরনুগ্রহ স্থির হইবে? এ যেন ইন্দ্র নীলাম করিতে বরিয়াছেন, সকলের চেয়ে চড়া ডাক উঠিলে তাহাকেই তিনি অনুগ্রহ রূপ দ্রব্য বিকাইয়া দিবেন।

বিশ্বাসের খাতিরে ধরিয়াই লইতেছি ইন্দ্রের আরাধনা করিলে ঐহিক উন্নতি লাভ করা যায়। অনার্যরা যদি নষ্টরাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রাণের দায়ে ইন্দ্রের উপাসনা করে তাহা হইলে ফল কী হইবে? আমাদের দেশে দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্তিপূজার ভাঁটা তো কোন দিন লক্ষ্য করি নাই। শুনিয়াছি প্রকৃত সাধকও অনেক ছিলেন। আমাদের মনে না হয় অবিশ্বাসের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাই পূজার চেয়েও প্রসাদে ভক্তিটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নানা সাহেব, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি বগলামুখীর স্তব আবৃত্তি করিয়া জিভ পুরু করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তবুও যুদ্ধে অধার্মিকদের এবং জগৎ প্রতারকদেরই জয় হইয়াছিল। যাক্ বর্তমানের কথা এখন থাক। দেশ জয় এক দিনের বা অল্প কয়েক দিনের ঘটনা। দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবাসীর উপর শাসন ভার চাপানো যায় না। কাজেই আরও কয়েকটি সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। দেশ জয়ের পর তাহা অধিকার করিয়া আয়ত্তে রাখিতে হইবে। অনার্যরা সংখ্যায় অধিক এবং আর্যরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। শাসনকার্যের দিকে মন না দিয়া শুধু ইন্দ্রের আরাধনা করার মতো সংকল্প তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা ঠিক বাস্তব দৃষ্টিতেই শাসন করিতে লাগিলেন। অনার্যদের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল, তাহা তাঁরা আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের শাসন ব্যাপারে দক্ষ করিয়া তুলিলেন। এবং বিজিত অনার্যদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্যই নানাবিধ ধর্ম ও সমাজতত্ত্বনীতির আড়ম্বর ফাঁদিলেন।

বর্ণবিভাগ—যাহাকে আমরা এক কথায় জাতিভেদ বলিয়া থাকি, এই অপকৌশলের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। বিজেতা জাতিরা, অথবা জয়েচ্ছু জাতির স্বজাতির উৎকর্ষ-খ্যাপন পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বকালে পরিদৃষ্ট হয়। আমেরিকায় নিগ্রো ঘৃণা, জার্মানির ইহুদি পীড়ন, অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতকায় কর্তৃক আদিম অধিবাসীদের বিলোপ সাধন, ইংরেজের স্বীয় সভ্যতার মাহাত্মবর্ণন এবং ভারতীয় সভ্যতার এবং সমাজের প্রতি অবজ্ঞা-দৃষ্টি, কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীদের প্রতি ইউরোপীয় শ্বেতকায়দের অমানুষিক অত্যাচার—ওই পূর্বকথিত বর্ণভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর্যরা মনে করিতেন তাঁহারা উচ্চবর্ণের জাতি। পূর্বে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের ভেদ ছিল না। দেশ জয় করিয়া স্থিতিশীল হইয়া শাসন করিতে করিতে এই ভেদবুদ্ধি তাঁহাদের বিবেচনায় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেদের তিনটি শ্রেণীতে ভেদ থাকিলেও সেই ভেদের প্রাচীরটি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। নিজেদের তিনটি শ্রেণীতে দ্বিজরূপ এক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেন। এবং নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাহাকেও সম্মানের ভাগ অধিক, কাহাকেও বা লৌকিক মর্যাদা অধিক, কাহাকেও বা অর্থাগমের উপায় অধিক করিয়া দিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির মোটামুটি রকমের সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন।

অনার্যদের শেখানো হইল তাহারা অনাদিকাল হইতে দৈব-বিধানে নিকৃষ্ট জাতি। তাহাদের বৈদিক দেব পূজায় বা প্রকৃতি পূজায় কোন অধিকার নাই। তাহারা এ পর্যন্ত যাঁহাদের পূজা করিয়া আসিতেছে হয় তাঁহারা দেবতাই নন, নয় তাঁহারা নিকৃষ্ট ধরনের জীব, অর্থাৎ অপাংক্তেয় দেবতা।

আর্য শাসনে যে সব অনার্যরা রহিলেন, তাঁদের এই সব তথ্য শুনিতে শুনিতে বিচারবুদ্ধির গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁরা শেষ পর্যন্ত আর্যদের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হইলেন। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হইল না। তখনও অনার্যেরা দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইন্দ্রের অনুগ্রহে ভারত জয় তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

আর্যরাও একটি দল নয়। নানা দল আসিতে লাগিল

এবং এই দলের মিলন ভালভাবে না ঘটার ফলে তাঁহাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও দেখা দিল। কোন কোন আর্যদল অনার্যদের সহায়তা লইয়া অপর আর্যদলকে পরাভূত করিতেও ইতস্তত করিলেন না। এইভাবে ইন্দ্রের একাধিপত্য আর্যমনেতেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। কারণ আর্যদের বিভিন্ন দলে একই দেবতা যে ইন্দ্র ছিলেন তাহার কোন পরিচয়ই বৈদিক সাহিত্যে বা যুক্তিতে পাওয়া যায় না। ইহার ফলে আর্য সমাজে বহু দেবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন এই দেবতাদের মধ্যে প্রধান কে হইবে? যে কোন দলের দেবতাই প্রধান না হইবে, সেই দলই অসন্তুষ্ট হইবে। যে অনার্যদের সাহায্য লইয়া আর্যদল নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহারা অনার্যদের দেবতাকে ভুলিতে পারিলেন না। কারণ এই যুগে মানুষ বিজ্ঞানে অনগ্রসর থাকার ফলে প্রকৃতির করুণা ভিক্ষা করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এবং দেব-দেবীদের তাঁরা মনে করিতেন প্রকৃতির নিয়ন্ত্রী শক্তি রূপে। এই জন্যই বারবার দেব-দেবীদের কথা নানাভাবে বলিতেছেন।

বহু দেব-দেবী আনিয়াও সমস্যার ঠিক সন্তোষজনক সমাধান হইল না। আর্যরা ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া ঐশ্বর্যজনিত সুখ-সুবিধা-সুযোগ ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আসক্তি বাড়িয়াই চলিল। অনার্যদের প্রতিরোধ শক্তি বিলোপ সাধনের জন্য একের পর এক নানা প্রক্রিয়া করিতে লাগিলেন। একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় এবং ঘোরতর ভয়ের দিনে যে বিশ্বাস আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল, এখন সেই বিশ্বাসকেই নানাভাবে পল্লবিত করিয়া রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তারপর কয়েকটি ধর্মবিধি পরিণামে কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দেবকেন্দ্রিক যে ধ্যানধারণা ছিল, তাহা অচল হইয়া গেল। এখন নীতিতত্ত্ব আনিতে হইল। সমাজনীতির মূলকথা মানুষকে সমান মর্যাদা দান করা। কিন্তু সেই পথে চলিলে অধিকৃত রাজ্য কায়েম করিয়া রাখা চলে না। সুতরাং কর্মবাদ বা দৈববাদ বা অদৃষ্টবাদ আনিতে হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকেরও পত্তন হইল। অত্যাচারীর পতন অনিবার্য। নিপীড়িতেরও সুদিন অনিবার্য। নীতির এই মূল কথাটিকে কৌশলে বিকৃত করা হইল। তাহার পরিবর্তে আসিল অদৃষ্টবাদ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে অত্যাচারীর সুখ-শান্তি চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। এবং নিপীড়িতদের পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলেই এই দুর্দশা। নিপীড়িতকুলে জন্মই পূর্বজন্মের পাপের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ক্ষমতায় আসীন আরাম-প্রিয় উচ্চবর্ণের বংশধরেরা সুখঐশ্বর্যে একমাত্র অধিকারী থাকিবেন, ইহাই এই কর্মবাদের মূল বক্তব্য।

দেবতা এখন পরম ব্রহ্ম। তিনি নির্বিকার। তাঁর বিচারকার্য কর্মের দ্বারা গ্রথিত। তিনি কর্ম হইতে এক ইঞ্চি সরিয়াও কোন ব্যক্তিকেই কিছু করিতে পারিবেন না। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি ভক্তকে অনুগৃহীত করিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত উচ্চকুল সম্ভূত না হইলে পূজার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। এক কথায় ঈশ্বরকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া কর্মবাদ, জাতিভেদবাদ উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার যা সদ্ উদ্দেশ্য তাহা পূর্বেই পরিস্ফুট হইয়াছে। আর্যদের সদুদ্দেশ্য একটি মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাহা এই: "স্যো না পৃথিবী নো ভবা নৃক্ষরা নিবেশনী॥ যৎচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ" (পৃথিবী তুমি আমাদের সুখকর হও, আমাদের যত কণ্টক অর্থাৎ শত্রু আছে তাহা হইতে মুক্ত হও এবং আমাদের নিবাসযোগ্য হও। হে বিস্তৃত পৃথিবী তুমি আমাদের মঙ্গল দান কর)।

এত প্রয়াস করা সত্ত্বেও সকল আর্যকে সুখী করা গেল না। অভাবঅনটন আর্য সংসারেও দেখা দিল। তাঁহারা বুঝিলেন দেবপূজা করিয়া ও অদৃষ্টের দিকে ঊর্ধ্ব নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে না। অন্ধ সংস্কার ত্যাগ করিয়া সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন ও সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করিয়াই সকলকে সুখী করা যায়। কাজেই অতীত বৈদিক যুগেও দেবতার অস্তিত্বে সংশয় ও পরলোকে অবিশ্বাস প্রভৃতি বেশ সুস্পষ্টভাবেই দেখা দিয়াছিল।

পশুপালন যুগের অগ্নি, মিত্র, ঊষা, সমাজপত্তন যুগের বরুণ, বিজেতৃ দলের ইন্দ্র, আক্রমণকারীর শক্তিদাতা অগ্নি—

সব একে একে ক্ষীণপ্রভ হইলেন। ক্রমশঃ প্রকৃতিবাদ মাথা উঁচু করিয়া উঠিতে চাহিল, কিন্তু আর্যরা বিপদ গণিলেন। প্রকৃতিকে মায়া অথবা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ জড়-শক্তিতে পরিণত করিতে তাঁহাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। এবং প্রকৃতিবাদকে পরাস্ত করিতে বহুলাংশে সক্ষমও হইলেন।

এই চৈতন্যের প্রাধান্যবাদ, জড়শক্তির গৌনতাবাদ, কর্মবাদ ও পরলোকবাদ এখনও পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাহাদের শিকড় সঞ্চার করিয়া দিয়া প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো বিরাজ করিতেছে। নানা ঝড় আসিয়াছে, বড় বড় ডালপালা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষটি এখনও সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। এই জন্যই কুমারিল ভট্ট তাঁর গ্রন্থে বলিয়াছেন : আমাদের চার্বাক মত গ্রহণ করিতেও আপত্তি নাই, যদি তাঁহারা আমাদের বৈদিক কর্মকাণ্ডটি মানিয়া লন। অর্থাৎ এই অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে সম্মত হন। যাক, আমরা এখন মূল কথায় ফিরিয়া আসি। এত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াও আর্যরা অনার্যদের সমস্ত দেশ জয় করিতে পারিলেন না। আর্য এবং অনার্য রাজ্য ভারতের বুকের উপরে পাশা-পাশি রহিয়া গেল। তখন আর্যদের চৈতন্যের উদয় হইল। অনার্যদিগকে মানুষের মর্যাদা দিতে বাধ্য হইল। শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে : "দৃতে দৃংহ যা মিত্রস্ব যা চাক্ষুষা সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষন্তান। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বানি, ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥" (জীর্ণ শরীরে আমাকে তুমি দৃঢ় কর। সকল প্রাণী আমাকে মৈত্রীর চক্ষে দেখুক। আমি সকল প্রাণীকে মৈত্রীর চক্ষে দেখিবার সামর্থ্য যেন লাভ করি। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে মৈত্রীর চক্ষে দেখি)।

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে কতক বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছি এবং অনেক বিষয় স্থানাভাব অথবা বুদ্ধিমাণ্ড বশতঃ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই। সেই সব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উপসংহারে সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে বলিতে চেষ্টা করিব।

১। আর্যরা যখন পশুপালন পূর্বক জীবনযাপন করিতেন তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ ছিল না।

(ক) তখন বিবাহবিধিও প্রচলিত ছিল না।

(খ) তাঁহারা গোষ্ঠীজীবন যাপন করিতেন।

(গ) তাঁহারা যাহা কিছু লাভ করিতেন সকলে প্রায় সমভাবেই বিভাগ করিয়া খাইতেন।

(ঘ) যে দেশে তাঁহারা বাস করিতেন সেই দেশটি ছিল তাঁহাদের সাধারণ সম্পত্তি।

(ঙ) আর্যদের কোন কোন দল যে যাযাবর ছিলেন না তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

(চ) সে সময় তাঁহাদের জীবনযাত্রার পথে অনেক বিপদ দেখা দিত। বিপদের পথ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধি অনুসারে নানা দেবতাকে রক্ষকরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। যথা, ইন্দ্র, মিত্র, উষা, অগ্নি, সোম ইত্যাদি।

২। আর্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁহারা ভারতে পররাজ্য-আক্রমণকারীরূপে দেখা দিলেন। তাঁহাদের শক্তি, উৎসাহ, উৎকট দুঃসাহসিকতা এবং অনার্য নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ নদীসমূহের বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁহাদের ভারত বিজয়ে সহায়তা করিল। এই বিজয় লাভের পরই এই দেশের ঐশ্বর্য তাঁহাদের এখানে স্থায়ী-ভাবে বাস করিতে প্রলুব্ধ করিল। এই সময় হইতে তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনের অনুরোধে নানা তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা—

(ক) দেবানুগ্রহে জয়

(খ) জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত অর্থাৎ সনাতন

(গ) কর্মবাদ

(ঘ) পরলোকবাদ, ইত্যাদি।

এই সব মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে যে আর্যদেরই রাজ্যশাসনে এবং রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি ভোগ করিবার একচেটিয়া অধিকার এবং অনার্যদের কর্তব্য সেবার জন্য কায়মন উৎসর্গ করা। ইহার ফলে তাহাদের পারলৌকিক মঙ্গল সুনিশ্চিত।

মানুষের কৃত্রিম শাসন স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়াঅধি কদিন চলিতে পারে না। এই জন্যই দেখা গেল আর্য-অনার্যর মধ্যে ব্যবধান দুর্লজ্ঘ্য করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আর্য-অনার্যর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিল। নানা বর্ণ-শঙ্কর জাতির উদ্ভব হইল। তাহার বিস্তৃত তালিকা শুক্ল যজুঃসংহিতায় দেওয়া আছে। সুতরাং তাঁহাদের প্রচারিত পূর্বকথিত মতবাদের অসত্যতা আচারে এবং ব্যবহারে আর্যরা পূর্বেই প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আর্য সন্তানেরা পুত্রাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য এবং সম্পত্তি ভোগের অব্যাহত অধিকার পাইতেন। নিজেদের আশু সুখ সম্ভোগের স্পৃহার দরুণ এবং দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ বিকৃত তত্ত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন ও ভাবী বংশধরদিগের পথ আরও অন্ধকারাবৃত্ত করিয়াদিলেন। এই ঐতিহ্যই আমরা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের বাণী বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। এখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত্য করিবার সময় আসিয়াছে। মানুষকে মর্যাদা দিয়া মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতে হইবে। পিছনের দিকে না তাকাইয়া প্রকৃত সামাজিক নীতি কী হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার এবং অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

———

"বিবর্তনের পথে প্রাণী যখন মানব পর্যায়ে এসে পৌছল, তার স্নায়ু-সংস্থান যন্ত্রে এক অতি গুরুতর সংযোজন ঘটল। কেবলমাত্র মস্তিষ্কের দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি গ্রাহীকেন্দ্রের উদ্দীপনা ও সেই উদ্দীপনাজনিত চিহ্ন থেকেই প্রাণী বাস্তব সঙ্কেত উপলব্ধি করে। শুধু লিখিত ও কথিত ভাষা ছাড়া প্রাকৃতিক ও সামাজিক বহির্বাস্তবের আর সব রকম ছাপ অনুভূতি ও ধারণা আমাদের কাছেও এইভাবে ইন্দ্রিয় মারফত আসে। একেই বলা হয় বাস্তব অনুধাবনের প্রথম সাঙ্কেতিক তন্ত্র আর এই তন্ত্র প্রাণী ও মানুষ সবারই আছে। কিন্তু ভাষা হচ্ছে বাস্তব সঙ্কেতের দ্বিতীয় তন্ত্র—প্রথম তন্ত্রের অনুভূতি ইত্যাদিকে জানাবার ইশারা। এই দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক তন্ত্র মানব মস্তিষ্কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কথাই আমাদের মানুষ করেছে।"

—আই. পি. পাভলভ।

কমলাকান্তের মন

গোপাল হালদার

"আমার মন কোথায় গেল? কে লইল?"—কমলাকান্ত খুঁজতে লাগলেন। পাঠকেরা জানেন কমলাকান্ত এই মন খুঁজতে গিয়ে কী খুঁজে পেলেন। একটু স্মরণ করে নিই।

প্রথম দফা: "একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ পাকশালা খুঁজিয়া দেখ। সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে।" কমলাকান্ত কথাটা না মেনে পারলেন না। আমরাই কি পারি? "যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুট-বুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিশ মৎস্য সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাঁচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানে আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না।" এ হেন পুণ্যপিপাসু কমলাকান্ত পাকশালে বাসা বাঁধতে চাইবেন বৈকি। "হালদারদিগের বাড়ির রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাঁহার বয়ঃক্রম ষাট্‌ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া আমার মন তাঁহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।" তাই কি কমলাকান্ত দেখলেন পলান্ন কোফ্‌তা প্রভৃতি রন্ধনশালার দেবতারা কেউ তাঁর মন চুরি করেন নি?

আমাদের কথাটা পরে বলব, কিন্তু কমলাকান্তের কথাই আগে শুনে নিই। কে তার মন চুরি করল?

দ্বিতীয় দফা: "বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা একেবারে গব্যরসাত্মক।" কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য কি? কমলাকান্ত জানাচ্ছেন, "তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়স চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিশি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্কি টিপের মত দেখাইত; সে রূপের হাসি পথে ছড়াইতে-ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত।" কিন্তু শুধু তাই করত না—পাড়ার ছোকরারা পিছনে লাগত, তাই কাব্যরসে ও গব্যরসে বিনিময় সম্ভব হত না। প্রসন্ন ও তার গাই-মঙ্গলা—দুয়ের প্রতিই কমলাকান্তের অনুরাগ স্বীকৃত। প্রসন্নের গবাক্ষতলে বা তার গোয়ালঘরের আনাচে-কানাচে কমলাকান্তের মন পড়ে থাকবার কথা। কিন্তু সেখানেও কমলাকান্তের মন খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথা গেল?

তৃতীয় দফা: কমলাকান্ত নিজের বুদ্ধিতেই এবার মনের সন্ধানে পথে বেরুলেন। "দেখিলাম এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে…" তারপর 'যুবতীর' যে বর্ণনা! আপনার-আমার পক্ষে কলকাতার পথে-ঘাটে এরূপ কোনো ভ্যানিটি-ব্যাগ-ধারিণীকে বলা চলত না, কিন্তু কমলাকান্তের পক্ষে এ কথা বলা অত্যন্ত স্বাভাবিক—"তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

"যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল, দর কষিয়া আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

কমলাকান্ত "শিক্ষাপ্রাপ্ত" হলেন, যে 'শিক্ষা' এ অভিজ্ঞতায় লাভ করবার তা তিনি সত্যই বুঝেছেন কিনা তা আমরা পরে বিচার করব। তবে কমলাকান্তের থেকে জানলাম—এই তৃতীয় ক্ষেত্রেও মনের সন্ধান না পেয়ে তিনি বুঝলেন "মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে

পারি না—কিন্তু বোধহয় কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি।"

চতুর্থ দফায় কমলাকান্ত তাই এগিয়ে গেলেন মনের ঝোঁকে, "আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।..." কিন্তু তাই বলে কি কমলাকান্ত হাল ছেড়ে দিলেন? "আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল্য নাই।" দীর্ঘ জিজ্ঞাসাটা শেষ হতে যাচ্ছে, তখন বুঝা গেল কমলাকান্তের এ সবই ভূমিকা। আসল কথাটাই তার শেষ কথা: "এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে তোমরা কেহ কমলাকান্তের বিবাহ দিতে পার?" এই হল মূল কথাটা কমলাকান্তের। কিন্তু এ অসাধ্য কাজ। কেউ তা করতে পারে নি। কমলাকান্তের শেষ বিদায়-কালেও জানি কমলাকান্তের ভাগ্যে সেই 'দিল্লী কা লাড্ডু' জোটে নি। কেন জুটল না? জুটলেই যে কমলাকান্তের পাগলামির অবসান হত, বলা যায় না। দেখা যাচ্ছে, কমলাকান্তর সাইকো-এনালিসিস দরকার ছিল। কমলাকান্ত বেঁচে নেই, প্রসন্নও নেই, রামমণি তো আগেই গঙ্গালাভ করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড আছেন, ইয়ুং আছেন, এড্‌লার আছেন। আর তাঁরা যদি বা না থাকেন, তাঁদের 'বিদ্যা' আছে। তা ছাড়া, বুদ্ধদেববাবু আছেন, অচিন্ত্যবাবু আছেন, 'অবধূত' আছেন, আর কেউ না থাক, আপনি-আমি আছি—আমরা যারা বাঙালী পাঠক, তারা কী না পারি? কমলাকান্তকে না পাই, তাঁর এই স্বীকৃতি আছে, জবানবন্দী আছে, এমনকি, এখনো কাগজের পাতায় তাঁর ভৌতিক লেখা প্রকাশিত হয়—বুঝতেই পারা যায় এ একটা সাইকো-প্যাথোলজিক্যাল কেস্। অতএব আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে—মানে, মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে কমলাকান্তর সাইকো-এনালিসিস করে ফেলি না কেন?

॥ ২ ॥

কেন কমলাকান্ত প্রথম মন খুঁজলেন পাকশালায়? অর্বাচীনরা মনে করবে তা ছাড়া কোথায় আবার মন খুঁজবেন ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত—ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণই যার পেশা? সত্য বটে, ঝোলগঙ্গায় অভিষেক-শুদ্ধ ইলিশ মৎস্যের কাছে প্রণত হব না, এমন বঙ্গ-সন্তান আপনি-আমিও নই। বিশেষ করে এযুগে—যখন জানি বাজারে ইলিশ মাছ কত দুষ্প্রাপ্য। আর ইলিশ মাছের দর কী। আপনি-আমিও বুঝি—কলকাতায় যদি ইলিশ মৎস্যই দুর্লভ হল তবে কলকাতায় বাস করা কেন? গঙ্গায় যদি ইলিশ মাছই অদৃশ্য হল তবে গঙ্গা থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? ফরাক্কা বাঁধেই বা কি প্রয়োজন? কিন্তু আপনি-আমি সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোএনালিস্ট। অতএব, আমরা জানি—আসলে ইলিশ মাছ, পোলাও-কোফতা, (এমন কি চীনে হোটেলের চিংড়িরান্না বা বার্ডস্‌নেস্ট সুপ—যদি কমলাকান্ত তার রসাস্বাদন করতে পেতেন) এ সবই হচ্ছে উপলক্ষ্য। কথাটা এই—মন চায় 'প্লেজার' এবং 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'।

অবশ্য এটা গ্যাস্‌ট্রোনমিক ব্যাখ্যা মাত্র নয়। হেডোনিষ্টিক ইণ্টারপ্রিটেশন অব কমলাকান্তর মন।

অবশ্য আর একটা ব্যাখ্যা করতে পারতাম—As you eat so you are—অর্থাৎ অন্নব্রহ্মই মনোময় ব্রহ্মের হেতু। অন্য ভাষায় বলা যেত—প্রথমতঃ যেমন খাবেন তেমনি হবে আপনার দেহ—মনের মূল দেহ আর পরিবেশ। তারপর দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ আর জগৎপ্রপঞ্চের এই উপস্থিত রূপ সামাজিক জীবন-ব্যবস্থা এতে মিলে, কাটাকুটি করে—গড়ে উঠবে আপনার মন। অর্থাৎ এটা হচ্ছে—Physio-socio-economic interpretation of কমলা-কান্তের মন।

কিন্তু আপনি-আমি বুঝি তাও হচ্ছে ওপরতলার কথা—গভীরে যেতে হবে। তার সূত্রও রয়েছে। ওই 'হালদারবাড়ির রামমণি'। বিয়ের কথাটা কমলাকান্ত চেপে গেলেও রামমণির প্রতি 'প্রসক্তির' কথাটা স্বগতোক্তির মধ্যে বলে ফেলেছেন। আসলে রামমণি যে পাত্রী হিসাবে আদর্শস্থানীয়া, একথা আপনি-আমি না মানি বড় বড় আর্টস্টরা মানবেন। স্যর উইলিয়ম অরপেন

পোর্ট্রেট্ আঁকলেন তাঁর পুরুষ রাঁধুনীর। বিলেতের কোটিপতির কন্যা-জায়া-দয়িতারা বললেন—'এ কি কাণ্ড, শিল্পী? আমরা পারি না আপনাকে দিয়ে পোর্ট্রেট্ আঁকাতে, আর আপনি কিনা আঁকলেন এই শে'র ছবি।' অরপেন উত্তর দিলেন, 'তোমরা রাঁধো দেখি কেউ ওর মতো।' রামমণির মতো যে রাঁধে ভালো, আবার পরিবেশনে মুক্তহস্তা, তার প্রতি 'প্রসক্তি' যে-কোন পুরুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। কারণ হৃদ্‌যন্ত্রটা পাকযন্ত্রের নিকটতম স্থল এবং হৃদয়-ক্ষেত্রটির পথ ওই পাক-প্রণালীর মধ্য দিয়ে। একথা বোঝেন বলেই তো দুপুরের সিনেমায় যাঁরা মনের খোরাক সংগ্রহ করেন তারাও হেঁসেলটি অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃত।

কিন্তু এহ বাহ্য। রামমনি গত হয়েছেন। কমলাকান্ত কোনো জীবিতা রামীর বা মণিমালার কথা না বলে এই ষাটোর্দ্ধা রামমণির কথা বললেন কেন? আসলে আমরা তো বুঝি—এহ বাহ্য। রামমণিও সিম্বল মাত্র। আর কিসের সিম্বল্? এই রন্ধন-সম্পর্কিতা মাতৃবয়সী নারী কার সিম্বল্ তা কমলাকান্ত না 'Zানতি পারলেও' আপনি-আমি বিংশ শতকের বাঙালী পাঠকেরা কি জানি না? স্রেফ মাতৃ-প্রতীক, আর 'প্রসক্তি' কথাটা না বুঝে বলে যে ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছে কমলাকান্তের অচেতন মন, তা যে-কোনো বালকও জানে—'ঈদিপাস কমপ্লেক্স'।

একের দফায় ধরা পড়ে যায় কমলাকান্তের মন কোথায়। এবার দ্বিতীয় দফাটা। অতি বিশদ করে এবার আর এনালিসিস করতে হবে না। প্রথমেই তো স্বীকার করেছেন কমলাকান্ত প্রসন্নর প্রতি তাঁর আসক্তি। তারপর একটু নষ্টামি করে আবার 'মঙ্গলা' গাইয়ের নাম পেড়েছেন। আপনি-আমি অবশ্য এসবে খেই হারাব না—আমরা জানি এ প্রসন্নও না মঙ্গলাও না—ও সবই সিম্বল্। আসল কথাটা ওই দুগ্ধ, আর গোদুগ্ধ নয়—মাতৃস্তন্য এবং তা মায়েরই ইঙ্গিত। প্রসন্নও নয়, মঙ্গলাও নয়, দুগ্ধও নয়—আরও অনেক গভীরে মূল। 'ডেপথ্ সাইকোলজি' আমরা জানি। কাজেই আমরা ছোকরাদের মতো কমলাকান্তের পেছনে লাগব না, বরং পেলে তাকে 'কনসাস' করে দোব। আর প্রসঙ্গত বুঝতে পারছেন কেন সমস্ত ভারতবর্ষে 'গোধন' এত গুরুত্ব পেল, 'গোমাতা' কথাটা নিতান্ত অস্পষ্টও নয়। এও বুঝতে পারছেন—কেন ডেয়ারি ফারমিং এত প্রয়োজনীয়। দৈহিক পুষ্টির জন্য নয়, অ-চেতন মনের তৃপ্তির জন্য।

এবার তৃতীয় দফাটা পরীক্ষা করা যাক্। আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। ভগিনীকে ফিরাইয়া দেওয়ার অর্থ পরিষ্কার; ইন্‌সেস্ট্ বিষয়ক ইঙ্গিত এখানে আছে—ভ্রাতা ভগ্নীর অবৈধ সম্বন্ধের কথা; আর সচেতন মনে জেগে উঠতেই কমলাকান্ত পালালেন। অবশ্য ইঙ্গিতে যা আছে তারও পিছনে অনুক্ত রয়েছে বেশি—সেটি ঈদিপাস্ সম্পর্কের মূল স্তর। আর কমলাকান্ত সেই যুবতীর কথায় যে 'শিক্ষা' পেয়েছেন আসলে তার অর্থ ওই ইঙ্গিত দিতেই তার মনে একটি 'রেজিস্টেন্স' জেগে উঠেছে। এই তৃতীয় দফার অন্য কোনোরূপ সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা বা সাইকিয়াট্রির কসরত চলবে না। এটিতে মুখ্য কথা আছে বলেই কমলাকান্ত আর এর পরে মন খুঁজতে বেরুলেন না। আর তার 'রেজিস্টেন্স'-এর অর্থ যে আসলে দ্বিগুণ স্বীকৃতি—, 'না' মানেই যে 'হ্যাঁ', বরং ডবল-জোরে 'হ্যাঁ' —এ কথাটা মনোবৈজ্ঞানিক মাত্রই জানেন।

এর পরে কমলাকান্ত কী বুঝলেন? 'সাবলিমেশন'-এর পথ খুঁজলেন? জানেনই তো, 'আইডেন্টিফিকেশন'—'অপরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে নেওয়া' —সেই পথ। কিন্তু তা বড় শক্ত ব্যাপার। যা কমলাকান্ত বলছেন তা হচ্ছে চিরদিনের নৈতিক বুলি—'সর্বমানবের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া।' অর্থাৎ সুপার-ইগোর সাধুবচন, শেখানো কথা। যা কমলাকান্ত করলেন তা হচ্ছে আবার ইগোর মহলে নেমে আসা। তাই অবিলম্বেই বললেন, 'তোমরা কমলাকান্তের একটি বিয়ে দাও।'

'কমলাকান্তের মনের' কিন্তু আসল হদিস পেয়ে গিয়েছি—ওই ইগো সুপার-ইগো মেলানো টাল-বাহানার মধ্য দিয়ে আমরা দেখে ফেলেছি—ঈদ্ সর্বজয়ী।

কিন্তু কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত এই দিল্লীর লাড্ডুর আস্বাদন করলেন কেন? তাও গভীর তত্ত্ব। তবে সেজন্য ইয়ুং-অ্যাডলারকেও কিছুটা টানতে হবে। আপাততঃ এখানেই থাক।

পাভলভ পরিচিতি

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভলভ্ (১৮৪৯-১৯৩৬) আমাদের দেশে এখনও অপরিচিত বললেই চলে। তাঁর 'কন্‌ডিশন্‌ড্-রিফ্লেক্স' কথাটি অল্পাধিক জানা আছে অনেকের কিন্তু এর সঠিক তাৎপর্য এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও প্রধানতঃ মনোবিজ্ঞানের উপর পাভলভের এই 'কন্‌ডিশন্‌ড্-রিফ্লেক্স আবিষ্কারের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণ সজাগ নন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

মনোবিজ্ঞান এই সেদিনও দর্শনশাস্ত্রের আওতার মধ্যে আটকা ছিলো। সত্যিকারের বিজ্ঞানের পর্যায়ে আসবার ও স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা দেখতেপাই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। এই সময় জার্মানীতে ওয়েবার, মুলার, হেল্‌মহোজ প্রভৃতি ফিজিওলজিষ্টরা দর্শন ও শ্রবণইন্দ্রিয় বিষয়ক বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন, ইংলণ্ডে "Expression of the emotions in men and animals" বইখানি এই সময় প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতেই ভোকনার ও উন্দ্ মনস্তত্ত্বের পৃথক গবেষনাগার স্থাপন করেন। আমেরিকায় জন হপকিন্স ইউনিভারসিটিতে মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাজকর্মের সূত্রপাত হয় ১৮৮১ সাল থেকে। এর কিছু আগে আবার মস্তিষ্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থান আবিষ্কার-পর্ব শেষ হয়েছে। মোট কথা উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে অধ্যাত্মবাদের আওতা থেকে মনোবিজ্ঞান বেরিয়ে এলো স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, এ্যানাটমী, ফিজিওলজী ও বায়োলজীর ক্রমোন্নতিই ক্রমশঃ দর্শনশাস্ত্র থেকে মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এলো। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল পদে পদে। মস্তিষ্ক যে মনন-ক্রিয়ার ভিত্তি এ ধারণা বৈজ্ঞানিকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের পক্ষে এ ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। মস্তিষ্ক যে কিভাবে কাজ করে—এ তাঁরা জানতেন না এবং মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কারের পদ্ধতিও তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কাজেই নানারকম কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না।

মনন-ক্রিয়া ও চৈতন্য সম্পর্কে দার্শনিকদের মতোই বৈজ্ঞানিকরাও অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগুতে চাইলেন। বলা বাহুল্য, এ-পন্থা বিজ্ঞানে অচল। ফল হল—হাজার রকমের থিওরী ও মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবদমান হাজার রকমের সম্প্রদায়। এইরকম ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তাই ঘটলো। এই সব থিওরী "Conformed more to ideological' requirements of the capitalist class than to objective reality (Hary wells—I. P. Pavlov' International Publishers, N. Y. pp 211)" এঁরা সবাই সামন্ততান্ত্রিক যুগের "অমর, অপরিবর্তনীয়" আত্মাকে নস্যাৎ করলেন, এবং বললেন মন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আবার মস্তিষ্ক কতকগুলো জন্মগত অপরিবর্তনীয় বিশেষ-বিশেষ গুণাবলীর আধার—এ-তত্ত্বের অবতারণা করে "নতুন বোতলে পুরোন মদ" পরিবেশনের কাজ করলেন মাত্র। উইলিয়ম জেম্‌সের কথাই ধরা যাক। আত্মাকে অস্বীকার করে বললেন মস্তিষ্কই মনের আধার। এই মস্তিষ্কের দুটো দরজা। সামনের ও পেছনের। সামনের দরজা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চৈতন্যের রাজ্য আর পেছনের দরজায় আছে অপরিবর্তনীয় সহজাত আদিম প্রবৃত্তি ও আবেগ ইত্যাদি। এই আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে আছে

ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের বাসনা, সেই সম্পত্তি রক্ষার্থ লড়াইএর তাগিদ ও আরও নানা রকমের হিংসাত্মক ও পাশব মনোভাব। ভদ্রলোক বা শ্রমিক হবার যোগ্যতা ও জন্মগত অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায়। 'বিধিদত্ত' কথাটাকে উহ্য রেখে পূর্ববর্তীকালের প্লেটো, সেন্ট জন, সেন্ট টমাসের কথারই পুনরুক্তি নয় কি এই থিওরি? পরবর্তীকালের ফ্রয়েডের মনের গঠন তত্ত্বের—(ইগো, সুপার ইগো, ইদ) মধ্যে ভিয়েনার তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষের নির্জ্ঞান মনই আসলে মানুষের ব্যবহার ও চিন্তাধারার নিয়ামক—এই তত্ত্ব জন্মগত সূত্রে আয়ত্ত প্রবৃত্তিগুলির প্রাধান্যই ঘোষণা করে না শুধু—মনোজগতের অপরিবর্তনীয়তারও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। নির্জ্ঞানতত্ত্ব আসলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞতার স্বীকারোক্তি। স্বার্থান্বেষীরা কিভাবে জেমস্ ও ফ্রয়েডকে কাজে লাগাচ্ছেন সমসাময়িক মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন।

মোট কথা, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞতা থেকেই মনস্তত্ত্বের এই দুর্যোগ। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার মূলে ছিল নতুন পদ্ধতির অভাব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ পদ্ধতির আবিষ্কার বিজ্ঞানে নতুন থিওরি আবিষ্কারের মতই গুরুত্বপূর্ণ। পাভলভ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি বিশেষ স্বকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই টেক্‌নিকের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করছিলো তাঁর অসামান্য সাফল্য। একটু পরেই এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

১৯০৪ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হজম ক্রিয়ার উপর নতুন আলোকপাতের জন্য পাভলভ নোবেল প্রাইজ পান। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো চালাবার সময় কুকুরের লালা ঝরার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। যে লোকটি কুকুরের খাবার দিতো তার পায়ের শব্দ শুনলেই কুকুরদের লালা ঝরতে শুরু হতো। থালা-বাসনের শব্দ শুনলেও লালা ঝরতো। কেন এই লালা ঝরে? নিউটনের—কেন আপেল মাটিতে পড়ে?—এই ধরনেরই প্রশ্ন। অতি সহজ প্রশ্ন—উত্তরও অতি সোজা সাধারণের কাছে। কুকুর বুঝতে পারছে খাবার আসছে, তাই। নিজের মনকে দিয়ে কুকুরকে বোঝবার এই প্রচেষ্টাই ছিল মনস্তত্ত্বের প্রশ্ন মীমাংসার উপায়। একে বলা যায় অন্তর্দর্শন (ইন্‌ট্রোস্পেক্‌শান)। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ প্রথা অচল। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অব্‌জেক্‌টিভ্ বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছাবার রাস্তা এ নয়, একথা পাভলভ বুঝেছিলেন। তাঁর মনে জাগলো দুটি কথা:—(১) কুকুর মানুষের মত চিন্তা করতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোথায়? (২) মস্তিষ্কের কোন ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এই লালা ঝরার সম্পর্ক? কুকুরের পক্ষে এটা মনন ক্রিয়ারই সামিল: কিন্তু এই মননক্রিয়ার তাৎপর্য কী? ছোট একটি অস্ত্রোপচার করে লালা নিঃসরণ গ্রন্থনালীর (স্যালিভারী ডাক্ট) এক প্রান্ত বাইরে এনে চামড়ার সঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হলো। তারপর কুকুরটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে—তার ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা, চালানো হবে। এই পাভলভীয় পদ্ধতিটি মস্তিষ্কবিজ্ঞান তথা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর নিয়ে এলো। সুস্থ, জীবন্ত প্রাণীর ওপর এর আগে ফিজিওলজিষ্টরা বড় একটা পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পেতেন না। একটা বিশেষ যন্ত্রকে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে—তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা যেতো। বলাবাহুল্য সুস্থ গোটা প্রাণীর মধ্যে যন্ত্রটি অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে বোঝবার উপায় এ নয়। এদিক দিয়ে পাভলভ পদ্ধতির উন্নত ধরন অনস্বীকার্য। আর এই লালা নিঃসরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা ও লালার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হলো এই পদ্ধতিতে। খাদ্য দেখে বা খাদ্য পরিবেশকের পায়ের শব্দের দরুন লালা নিঃসরণ যে উচ্চতর মস্তিষ্কের ক্রিয়া—এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। এতদিনে উচ্চ মস্তিষ্কের ক্রিয়া কলাপের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হলো। মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কলাপের হদিশ নির্ণয়ের সূত্রপাত এই সময় থেকে। ল্যাবরেটরীতে নিয়ন্ত্রিত ও পূর্বনির্ধারিত অবস্থার মধ্যে মস্তিষ্কের—বিশেষ করে গুরু মস্তিষ্ক (করটেক্স-সেরিব্রাই) নিয়ে গবেষণা শুরু হলো প্রকৃতি বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী।

ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেওয়া হচ্ছে কুকুরকে। কয়েকবার এইরকম করার পরে শুধু ঘণ্টা-বাজানোর পর দেখা গেলো কুকুরের লালা ঝরছে ও সে খাবার জায়গার দিকে যাবার চেষ্টা করেছে। এইটি হচ্ছে কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স আবিষ্কারের আদি এক্সপেরিমেন্ট। ঘণ্টাধ্বনিকে বলা হয় শর্তাধীন উদ্দীপক (কন্‌ডিশন্‌ড্ ষ্টিম্যুলাস্) ও কুকুরের ওপর তার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত (কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স)। খাদ্যের সঙ্গে মুখের সংস্পর্শে স্বাভাবিকভাবে যে লালা নিঃসরণ হয়ে থাকে তাকে বলা হয় শর্তহীন পরাবর্ত (আন্ কনডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স)। একেই সাধারণতঃ বলা হয়—সহজাত আদিম জৈবক্রিয়া (ইন্‌স্টিঙ্কট্যুয়াল এক্টিভিটি)। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নিম্ন মস্তিষ্ক (সাব-কর্টিকাল্ রিজিয়ান্)। কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স নিয়ে জীব জন্মায় না। এই রিফ্লেক্স বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আয়ত্ব করে। ঘণ্টাধ্বনি উচ্চ মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে যে উদ্দীপনা জাগায়—সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সহজাত জৈব-ক্রিয়ার দরুন নিম্ন-মস্তিষ্কের উদ্দীপনার যোগাযোগ ঘটার ফলে, পরবর্তীকালে শুধু ঘণ্টাধ্বনি খাদ্য-প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। এইভাবে জন্মের পর-মুহূর্ত থেকে মানব শিশু (সব প্রাণীই) বহির্বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, নতুন গুণ আয়ত্ব করে ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। এই হচ্ছে জীবজগতের শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। এই ক্রিয়াকলাপ (কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স) একান্তভাবে উচ্চ-মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। আন্ কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স জাতিগত (species) বৈশিষ্ট্য আর কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এক এক জাতীয় প্রাণী কতকগুলো আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স (সহজাত আদিম প্রবৃত্তি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এগুলো তাদের শিখতে হয় না। মাকড়সার জাল বোনা, বাবুই পাখীর বাসা বাঁধা এ সবই আন্ কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স। মানবশিশু কতকগুলো সহজাত আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলো মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, সহজাত প্রবৃত্তি বা ইন্‌ষ্টিংটুয়াল এ্যাক্‌টিভিটি অনেকগুলো আন্ কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সের জটিল মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত। তবু সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধে আমরা আন্ কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স আর ইন্‌সটিঙ্কট্যুয়াল্ এ্যাক্টিভিটিকে সমার্থবাচক হিসাবে ব্যবহার করেছি।

কেমন করে এই কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী হয় আমরা দেখেছি। এর ফিজিওলজি নিয়ে আলোচনা হয়তো অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবে, এজন্য সে-পথে না গিয়ে আপাততঃ এর তাৎপর্য ও পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব সম্পর্কিত আলোচনা করা যাক।

যে কুকুরকে কন্‌ডিশন্‌ড্ করা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার কাছেই মাত্র ঐ ঘণ্টা বাজানোর দাম আছে। অন্য কুকুর ঘণ্টা-বাজানোর দ্বারা উদ্দীপ্ত হবে না—তার লালা ঝরবে না। শুধু ঘণ্টাধ্বনি নয়, যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপক দিয়ে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ত্বক ইত্যাদি মারফৎ) কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী করা সম্ভব। যে কোনো আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সের উত্তেজক ও বহির্জাতের যে-কোনো উদ্দীপক এইভাবে সংযুক্ত হয়ে নতুন কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে। অনেক পুরানো কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স এর ওপর ভিত্তি করে আবার নতুন কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী হতে পারে।

একটা খুব দরকারী কথা এখনও বলা হয়নি। আন্‌কনডিন্‌ড্ রিফ্লেক্স সর্বাবস্থায়, সব সময় একইভাবে কাজ করবে—এটা চিরস্থায়ী ব্যাপার। অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীতে পথ তৈরীই রয়েছে। কিন্তু কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ক্ষণস্থায়ী ও সর্বাবস্থায় কার্যকরী হবে না। শর্তগুলি যথাযথ না হলে রিফ্লেক্স তৈরী হবে না। একবার একটি কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স তৈরী হলে সেটা চিরকালই টিঁকবে, এমন নয়। ঘণ্টা-বাজানোর পর যদি কয়েকবার কুকুরকে খাবার দেওয়া না হয়—অর্থাৎ শর্তহীন উদ্দীপনা যদি বন্ধ থাকে, তবে ঘণ্টা-বাজানোর পর লালা নিঃসরণ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াবে। এমন কি ঘণ্টা বাজলে কুকুর হয়তো খাবারের পাত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স ক্ষণভঙ্গুর বটে, তবে একবার

একটি তৈরী হলে তার রেশ অনেকদিন অবধি থেকে যায়।

এর তাৎপর্য সবিশেষ। কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স মাধ্যমে জীব বাইরের জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স যদি অপরিবর্তনীয় বা চিরস্থায়ী হত তাহলে সে সম্ভাবনা মোটেই থাকতো না। জীব জগতের নতুন শিক্ষা সম্ভব হতো না।

আগেই বলেছি পাভলভ দেখিয়েছেন যে কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী হয় শুধু উচ্চমস্তিষ্কে (সেরিব্রাম)। প্রাণীজগতে বিবর্তনের সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলী জটিলতর হতে হতে মানুষের বেলায় মস্তিষ্ক এমন কতকগুলো নতুন ধরনের আধার হয়েছে,—যা একান্ত মানবীয়। এর ফলে মানুষের পক্ষে শুধু পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা নয়; পরিবেশকে, বহির্বাস্তবকে, প্রকৃতিকে নিজের সুবিধামত পরিবর্তিত করার ক্ষমতা লাভও সম্ভব হয়েছে।

জেমস্, ফ্রয়েড ইত্যাদি দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকেরা মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ভিত্তি না পাওয়ায় মন ও চৈতন্য সম্বন্ধে যেসব অনুমান করেছিলেন, সে সব অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বার্থ-সন্ধানীর দল তাঁদের অন্তর্দর্শন-সৃষ্ট তত্ত্বগুলো নিজেদের স্বার্থে লাগাতে পেরেছে। একথা আগেই উল্লেখ করেছি। সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ল্যাবরেটারীতে কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী করে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাভলভ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতকগুলো সাধারণ সূত্রের সন্ধান পান। মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন ও কার্যকারণ সম্পর্কিত—তাঁর প্রামাণ্য গবেষণার ফলে আমরা আজ তা' বুঝতে পেরেছি। তাঁর সূত্রগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ও বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসম্বন্ধে বিস্তার করা এখানে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে দুচারটে কথা বলবো।

দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাভলভ জৈবক্রিয়া সম্পর্কিত কতকগুলো প্রামাণ্য সূত্রের সন্ধান দিলেন।

প্রথমতঃ—গুরুমস্তিষ্ক (মানুষ সমেত সমস্ত উচ্চ প্রাণীর বেলায়) দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় জৈব-ক্রিয়ার নিয়ামক ও নির্দ্ধারক। প্রতিটি যন্ত্র, গ্রন্থি—সে হৃৎপিণ্ডই হোক আর থাইরয়েডই হোক—গুরুমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রনাধীন। চালু ডাক্তারী ধারণা—আমাদের স্নায়ুমণ্ডল দু'ভাগে বিভক্ত—একটি উচ্চ মননক্রিয়ার (যথা—চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছা-প্রণোদিত ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি) জন্য ও অপরটি স্বয়ংক্রিয় জৈব-ক্রিয়ার জন্য (হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, দেহের পরিণাম-ক্রিয়া ইত্যাদি) আজ অচল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের সমাবেশ করেছেন পাভলভ ও তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকের দল। এক কথায় একে বলে—নার্ভীজম্।

দ্বিতীয়তঃ—গুরুমস্তিষ্ক কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স মারফৎ বহির্বাস্তবের সামান্যতম পরিবর্তনের সঙ্গে জীবদেহ ও সমস্ত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপের সারাক্ষণ সম্পর্ক সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছে। এর জন্যে প্রয়োজনমত আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সকে বহির্বাস্তবের নতুন-নতুন উদ্দীপকের সঙ্গে কন্‌ডিশন্‌ড্ করাতে হচ্ছে। একদিকে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত করছে জীবন ধারণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ইত্যাদি আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সের তাগিদে খাদ্যান্বেষণ, বিপদ থেকে দূরে থাকা, সঙ্গী খোঁজা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে। আবার অন্যদিকে এই সবের দরুন বহির্বাস্তবের যে পরিবর্তন ঘটছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে—মানুষের সঙ্গে তার বহির্বাস্তবের এক চলমান সামঞ্জস্য (ডাইনামিক্-ইকুইলি-ব্রিয়াম্) রেখে চলেছে মস্তিষ্ক। এ দুটি সূত্র জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পক্ষে মহামূল্যবান।

তৃতীয় সূত্রটী মানব-মস্তিষ্কের বিশেষত্ব-বিষয়ক। মানব-মস্তিষ্ক পশু-মস্তিষ্কের ক্রমবিবর্তনের চরম পরিণতি, কিন্তু তাই বলে পশু-মস্তিষ্ক আর মানব-মস্তিষ্ক এক ধরনের নয়। জীবনের সায়াহ্নে মনোবিকার নিয়ে গবেষণার ফলে পাভলভ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে—পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ (যা পশুদের একমাত্র জগৎ) ছাড়াও মানুষের ভাষা-গ্রাহ্য একটি আলাদা জগৎ আছে। প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষ লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় ক্রমশঃ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে ও হাতের বিশেষ ব্যবহারে

অভ্যস্ত হয়। পশুজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাবার প্রথম ধাপটি হল-হাতিয়ার ব্যবহার শেখা। এর পর এলো সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার তাগিদ। প্রয়োজন হলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও ভাববিনিময়ের। উৎপত্তি হলো শব্দের। সুশৃঙ্খলিত শব্দমালা থেকে তৈরী হলো বর্বর যুগের প্রথম ভাষা। আভ্যন্তরীণ কতকগুলো যন্ত্রপাতিতে (ভোক্যাল্ কর্ড, ল্যারিঙ্কস্) ঘটলো বিশেষ পরিবর্তন, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কেরও। মানব-মস্তিষ্কে নতুন ধর্ম ও গুণ আরোপিত হলো। মস্তিষ্কের এই বিশেষ মানবীয় পরিবর্তন পশুদের অলভ্য অসংখ্য গুণের অধিকারী করে তুললো মানুষকে। বহির্বাস্তবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সঙ্কেতকে ভাষা করলো সামান্যীকৃত ও বিয়োজিত (জেনারেলাইজেসান ও এ্যাব্‌ষ্ট্রাক্‌সন)। তার ফলে উদ্ভূত হলো সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণা। এই ভাষার দৌলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও তার থেকে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে শিখলো মানুষ। পশুর সম্বল শুধুমাত্র নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা আর মানুষের কাজে লাগছে হাজার-হাজার বছর ধরে সঞ্চিত লক্ষ-লক্ষ মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞান—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সঙ্কেতের বিয়োজন ও সামান্যী করণেরই ফল। বস্তুজগৎকে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করে চৈতন্যের ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় এই ভাষা। আবার এই প্রতিফলনজনিত জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে বাস্তবের ওপর প্রয়োগ করে এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করি; ভুল সংশোধন করি; বাস্তব-সত্যের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে চলি। এইভাবে ক্রমবিকশিত হচ্ছে মানুষের সভ্যতা। এইভাবে বিজ্ঞানীরা নিত্য নূতন তথ্য সংগ্রহ করে নতুন থিওরী তৈরী করছেন; সেই থিওরী প্রয়োগ করতে গিয়ে তার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ছে, সংগৃহীত হচ্ছে আরও নতুন তথ্য, তৈরী হচ্ছে নতুন তত্ত্বের বুনিয়াদ। ভাষার দৌলতে মস্তিষ্কে যে নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো—পাভলভের পূর্ববর্তী আর কোন বৈজ্ঞানিকই এই পরিবর্তনের স্বরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হন নি।

পাভলভ মস্তিষ্কের এই সংযোজিত স্তরটির নাম দিলেন দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র বা সেকেণ্ড সিগ্‌নালিং সিসটেম। প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির স্তর। পশু ও মানুষ উভয়ই এই স্তরের অধিকারী। দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের অধিকারী শুধু মাত্র মানবমস্তিষ্ক। এ সম্বন্ধে জড়বাদী পণ্ডিতেরা অনুমানই করে এসেছেন এ-যাবৎ। পাভলভের আবিষ্কার এই অনুমানকে বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিলো। পশু-মন ও মানব-মন-এর প্রভেদ বুঝতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নেবার আর প্রয়োজন রইলো না। নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হলো—চৈতন্য মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের প্রতিফলন। মানব-মস্তিষ্ক বিবর্তনেরই এক বিশেষ অবস্থা। বস্তুই আদি ও প্রাথমিক: চৈতন্য বস্তু-সাপেক্ষ।

উল্লেখ করা উচিত যে, এই সাংকেতিক স্তর দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। এক অপরকে শুধু প্রভাবিত করছে তাই নয়, এক অপরের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল: প্রথমটির বিশেষ বিবর্তনের ফলেই দ্বিতীয়টির উদ্ভব।

পাভলভের মতে দেহ-মন-সমান্তরালবাদ (সাইকো-ফিজিক্যাল্ প্যারালাল্‌ইজম্) দেহ-মন-একাত্মবাদ (সাইকো-ফিজিক্যাল আইডেন্‌টিটি) এর মতই ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। মননক্রিয়া মস্তিষ্কের কোষ-স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল মানে এই নয় যে—মস্তিষ্কই মন। পাভলভ-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধরনের ভ্রান্তধারণা সাধারণের মধ্যে চালু দেখা যায়। ওয়াটসন প্রবর্তিত ব্যবহারবাদ ও যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে পাভলভ-বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

যাবতীয় মনন-ক্রিয়া (চৈতন্য-সমেত) বহির্বাস্তবের প্রতিফলন, এই নতুন সূত্রটি পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব। মানুষে-মানুষে যে প্রভেদ, (মনোগত ও ব্যবহারগত) সে-প্রভেদ জন্মগত বা বিধিদত্ত প্রভেদ নয়; শুধুমাত্র পরিবেশের পার্থক্য থেকে সে-প্রভেদের উদ্ভব—এই হলো নতুন মনোবিজ্ঞানের সব থেকে বড় কথা। এর তাৎপর্য অপরিসীম। সেই আদিকালের দাস-সমাজ থেকে আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজে এই ধারণাই চালু যে—মানুষে মানুষে ক্ষমতার ও ব্যবহারের যে পার্থক্য; সে-পার্থক্য স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয়। প্লেটো থেকে ফ্রয়েড

—সকলেরই এই মত। একদল লোক সংখ্যায় নগন্য হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর প্রভুত্ব করছে ঃ জন্মগত মানবিক গুণের তারতম্যের জন্য ; এই বলে ব্যাখ্যা করতে পারলে শোষকশ্রেণীর খুবই সুবিধা হয় নিঃসন্দেহ। শ্বেতজাতির প্রাধান্যের মূলে তাদের বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব একথা পাভলভবিজ্ঞান স্বীকার করে না। বুদ্ধি বা শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মনস্তত্ত্বের চালু পরীক্ষাগুলো (আই, কিউ টেষ্টিং) পাভলভীয়ানদের কাছে অচল। বাস্তব পরিবেশ—বুদ্ধিই বলুন আর ধ্যান-ধারণাই বলুন, সব কিছুকেই প্রভাবিত করছে। এ সম্পর্কে লিওন্‌টিয়েভের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লিওন্‌টিয়েভ দেখিয়েছেন যে, শিশুদের শিক্ষার কোন বিষয়ে পেছিয়ে থাকা জন্মগত অক্ষমতা বা দৈন্য সঞ্জাত নয়, পরিবেশের প্রভাব সম্ভূত এই অনগ্রসরতা। ছয় সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা এই পশ্চাদপদ শিশুদের মস্তিষ্কে নতুন কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী করিয়ে —তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে, মস্তিষ্কের অক্ষমতা অপরিবর্তনীয় নয় (অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'Communication at the XIV International Congress of Psychology, Montreal 1954' পড়ে দেখতে পারেন)।

পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ —আফ্রিকার অসভ্য (?) মানুষ থেকে শুরু করে অতি সভ্য আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ—সকলেরই মস্তিষ্ক প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। অতি আধুনিক সভ্যতার উপকরণের মধ্যে যদি অতি পশ্চাৎপদ কোন মানবগোষ্ঠীকে এনে ফেলা যায় ও সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়—তারা এই আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে ও অগ্রগামী গোষ্ঠীদের সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিতে পারবে।

পরিবেশ কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের মাধ্যমে নতুন শিক্ষা দিয়ে মানুষকে নতুন গুণের অধিকারী করে। এই শিক্ষা-গ্রহণের জন্য মস্তিষ্কের সাংকেতিক স্তর দুটির অবস্থান ও সুস্থতাই যথেষ্ট।

মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই মনোবিজ্ঞানের আজ শৈশব অবস্থা। আমরা মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিলতার সবকিছু হদিস আজ এর সাহায্যে দিতে হয়তো পারবো না ; কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিস্তারিত গবেষণার ও উন্নতির মধ্যে নিহিত রয়েছে অশেষ সম্ভাবনা। আজ আমরা প্রকৃতির অনেক কিছু নিয়ম-কানুন জেনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী বাইরের জগৎকে পরিবর্তিত করতে অন্তত আংশিকভাবে সক্ষম হচ্ছি। তেমনি আশা করা যেতে পারে, মনন ক্রিয়ার ও চৈতন্য বিকাশের সঠিক নিয়ম-কানুন জানার পর অন্তর্জগতকেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারবো। 'আত্মানাং বিদ্ধি'র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এতদিনে কি মানুষের আয়ত্বে আসতে যাচ্ছে? ব্যক্তি-মানস ও সমাজ-মানস এর বিচ্ছিন্নতা ও বিকল্পের ফলে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সৃষ্টি ; ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে স্বার্থ নিয়ে যে হানাহানি, মনোবিজ্ঞানের উন্নতি নিশ্চয়ই তার দ্রুত অথচ শান্তিপূর্ণ সমাধান নির্দ্ধারণে সহায়ক হবে।

এই প্রসঙ্গে বিকফের গবেষণালব্ধ একটি প্রত্যয়ের কথা উল্লেখযোগ্য। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিকফ দেখিয়েছেন যে, মানুষের বেলায় তার দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর (অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মানসিক স্তর) তার আন্‌কন্‌ডিশনড্ রিফ্লেক্সকে খানিকটা অন্ততঃ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। একটা উত্তাপ সম্পর্কিত এক্স-পেরিমেন্টের কথা শুধু বলবো। ১১০° ফারেনহিট পর্যন্ত গরম করা একটি রবেল পাইপ একজন লোকের চামড়ার উপর লাগিয়ে ও বারবার ঘন্টা বাজিয়ে, ঘন্টা বাজানোর সঙ্গে উত্তাপজনিত আন্‌কনডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সকে [সহজাত ক্রিয়া—যেমন গরম বোধ ও স্থানীয় রক্তবাহী শিরাগুলির প্রসার (ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন)] কনডিশনড্ করা হলো। অর্থাৎ ঘন্টা বাজালেই [উত্তাপ প্রয়োগ না করেই] লোকটি গরম অনুভব করতে লাগলো আর যন্ত্রে রক্তনলীর প্রসার ধরা পড়লো। তখন দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের একটি উদ্দীপক ও ঘন্টার সঙ্গে প্রয়োগ করা হলো। বলা হোল—'ঘন্টা বাজাই'। কয়েকবার এই রকম করার পর 'ঘন্টা বাজাই' কথাটিই ঐ ব্যক্তির উত্তাপ অনুভূতি ও

রক্তনালীর বিস্ফারণ ঘটাতে পারলো। এখন কয়েল পাইপকে ১৫০° ফারেনহিটে উত্তপ্ত করা হোল। ১১০ ডিগ্রী উত্তাপ শীতের দেশে বেশ আরামদায়ক। কিন্তু ১৫০ ডিগ্রী যন্ত্রণাদায়ক। এ ছাড়া অল্প গরম যেমন রক্তবাহী নালীকে উত্তপ্ত করে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়, ১৫০ ডিগ্রী গরম রক্তবাহী শিরাকে সংকুচিত ক'রে রক্তচলাচল কমিয়ে দেয়। এইবার কনডিশন্‌ড্‌ করা লোকটি ও অন্য একটি লোকের চামড়ার ওপর ঐ ১৫০ ডিগ্রী কয়েলটি রেখে তার ফলাফল দেখা হলো। অবশ্য বলা বাহুল্য ঘণ্টা বাজাই কথাটি দুইবারই উচ্চারণ করা হলো, আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অবশ্য ঘণ্টা বা কোন কিছুর সঙ্গেই কনডিশন্‌ড করা হয়নি। প্রথম ব্যক্তি আরামদায়ক গরম অনুভব করলো তার যন্ত্রে দেখা গেল শিরার প্রসার ; আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যন্ত্রণাতে হাত সরিয়ে নিলো ও তার যন্ত্রে দেখা গেল শিরার সংকোচন। ভাষা বা চিন্তা (সামাজিক উদ্দীপক) আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়াকে যে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারে, তা বিকফের এ ধরনের এক্সপেরিমেন্টগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করছে। সোজা কথায় মানুষ সহজাত আদিম প্রবৃত্তি ও আবেগের দাসমাত্র নয়। পাশববৃত্তি সমাজের উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষ শুধু বায়োলজিকাল নয়, প্রধানত সোশ্যাল। হিংসা, দ্বেষ, অবাধ যৌনাকাঙ্ক্ষা, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি এ-গুলোর উপরে সভ্যতার প্রলেপ লাগিয়েছে-মাত্র মানুষ ; একথা উদ্দেশ্যমূলক ও অবৈজ্ঞানিক। মানুষের সভ্যতা আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করছে ও করবে।

পাভলভ ও তাঁর সহকর্মীদের পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তার সামান্যতম পরিচয়ও যদি এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে ও পাভলভ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি পাঠকের কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও জাগিয়ে থাকতে পারি তা হলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

[আন্তর্জাতিক, নভেম্বর ১৯৫৮]

মানব-মন

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের—আধুনিকধারা পরিচায়ক পত্র সংকলন

বহু বিশিষ্ট মনোবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীর লেখায়
সমৃদ্ধ আগামী সংখ্যার 'মানবমন' অক্টোবরের
সাত তারিখ বের হবে।

॥ দাম এক টাকা ॥

এজেন্সীর সর্ত্তাবলীর জন্য পত্র লিখুন ঃ—

কর্মসচিব, মানবমন,

১৩২।১এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা কর্তৃক 'অভ্যুদয়', ৩০ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩২।১ এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ থেকে প্রকাশিত।

BOOKS FROM SOVIET UNION

MEDICAL SCIENCE & PSYCHOLOGY

F. ASRATYAN—I. Pavlov—Life & Works 0·75

A. IVANOV—Essays and the Pathophysiology of the Higher Nervous Activity 2·87

V. ZELENIN—Strengthen Your Heart 1·87

The Cerebral Cortex and the Internal Organs 9·87

I. VELVOVSKY—Painless Childbirth through Psychoprophylaxis & others 6·25

K. FIGARNOV—Painless Childbirth 0·12

K. PLATONOV—The Word as a Physiological and Therapeutic Factor 9·37

ON STAGE & SCREEN

V. KOMISSARZHEVSKY—Moscow Theatre (With Illus.) 9·37

K. STANISLAVSKY—My Life in Art 4·69

S. IISENSTEIN—Notes of a Film Director 3·12

N. CHERKASOV—Notes of a Soviet Actor 3·00

The Vakhtangov School of Stage Art (Illus.) 4·69

CLASSICS & MODERN FICTION

N. GOGOL—
- Evening near the Village of Dikanka 2·25
- Taras Bulba ... 0·75
- Mirgorod ... 2·00

A. PUSHKIN—
- Captain's Daughter ... 1·31
- Tales of Ivan Belkin ... 1·12
- Dubrovsky ... 0·56

L. TOLSTOY—
- Childhood, Boyhood, Youth 3·00
- Tales of Sevastopol ... 2·25
- Cossacks ... 1·50
- Resurrection ... 3·19
- Short Story ... 2·50

F. DOSTOYEVSKY—
- Insulted and Humiliated 3·37
- My Uncle's Dream ... 2·62
- Poor Folk ... 1·25

I. TURGENEV—
- Hunter's Sketches ... 2·81
- Nest of the Gentry ... 1·56
- Rudin ... 1·87
- On the Eve ... 1·31
- Fathers and Sons ... 2·00

V. KOROLENKO—
- Blind Musician 0·87

M. GORKY—
- Foma Gordeyev ... 2·62
- Five Plays (Plays) ... 2·62
- Mother ... 2·56
- Artamonovs ... 2·25
- Selected Short Stories ... 2·25
- Tales of Italy ... 1·31
- Childhood ... 1·62
- My Universities ... 1·37
- My Apprenticeship ... 2·00
- Literary Potraits ... 1·56

M. SHOLOKHOV—
- And Quite Flows the Don (in 4 Vols.) ... 11·00
- Virgin Soil Upturned ... 3·00

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12 BANKIM CHATTERJEE ST., CALCUTTA-12.

172 Dharamtala St., Cal.-13. *Branches :* **Nachan Rd., Benachity, Durgapur 4.**

V/o MEZHDUNARODNAYA KNIGA—Moscow 200